

রবার্ট ফুলটন

রালফ ন্যাডিং হিল

বাষ্পীয় পোত আবিষ্কর্তা

রবার্ট ফুল্‌টন

রালফ্‌ ন্যাডিং হিল

অনুবাদঃ ধ্রুবজ্যোতি সেন

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ১৯৮৩

মূল্য ঃ সাত টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅজিতকুমার রায়
শ্রীসারদা প্রিন্টিং,
৩১/১ ঘোষ লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

Robert Fultan And the Steamboat by Ralph Nading Hill

Original Edition Published by Random House, Inc. New York.

উপহার

....

....

....

....

সূচীপত্র

★

১

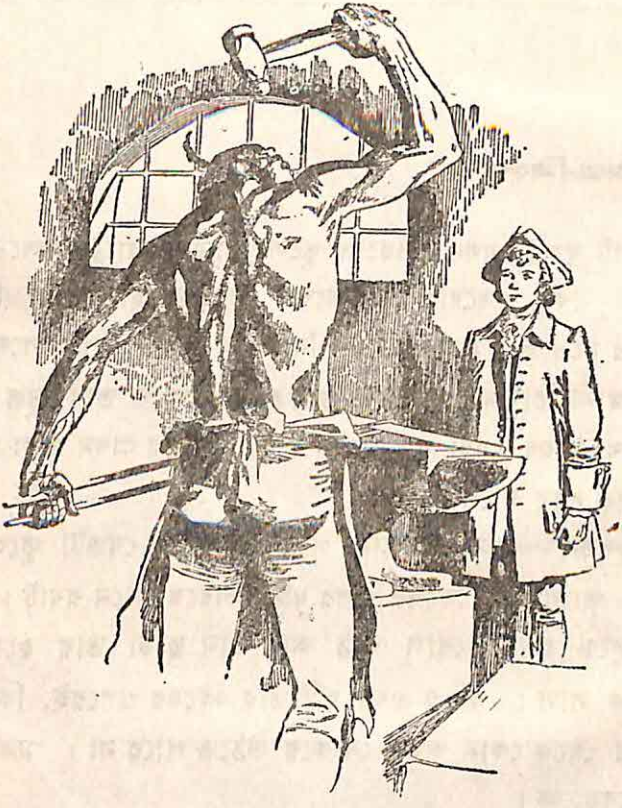
দিবাস্বপ্ন-বিলাসী

রবার্ট ফুল্‌টন যখন ন'বছরের স্কুলের ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রের তখনো স্বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তেরোটি উপনিবেশ জুড়েই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লোকের মনোভাব হয়ে উঠেছিল বিরূপ ও তিক্ত। পথে পথে রোল উঠত 'স্বাধীনতা' আর এ রোল শুনতে বা বুঝতে তার ভুল হবার কথা নয়, কারণ সেটা হল ১৭৭৪ সাল, বিপ্লবের প্রথম গুলি চলবার মাত্র এক বছর আগের কথা।

"ফুল্‌টন"—মাস্টার মশাই গর্জে ওঠেন। বেতটা তুলে নেন তিনি। তাড়াতাড়ি ডেস্কের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে রবার্ট। সারা ক্লাস জুড়ে হাসির রোল ওঠে আর কান দুটো তার হয়ে ওঠে টকটকে লাল। যদিও এখন দৃষ্টি তার বইয়ের ওপরেই, কিন্তু তার পাতার থেকে কোন অর্থই সে করে উঠতে পারে না। মনটা তার ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শৈশবে সে বিশেষ মনোযোগী ছাত্র ছিল না। বাড়ি ফিরত প্রায়ই মাস্টার মশাই-এর বেতের চিহ্ন নিয়ে। "মাথাটা আমার নিজের কল্পনাতে এতই ভর্তি যে বইয়ের যত সব আজে-বাজে কথা রাখবার জায়গা সেখানে একদম নেই", মার কাছে সে অনুযোগ করত।

ক্রমে ক্রমে স্কুলের বাইরে বন্ধুরা তার নাম দিলে "পারাওয়ালা বব্", কারণ সব সময়েই সে ওই আশ্চর্য জিনিসটি নিয়ে নানারকম



শক্ত হাতওয়ালা কামারকে তার কামারশালায় কাজ করতে দেখতে রবার্টের ভাল লাগত

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাত—কি পরীক্ষা তা অবশ্য জানা যায় না। তবে একথা সত্যি যে তার অবসর সময়ের বেশীর ভাগই সে কাটাত

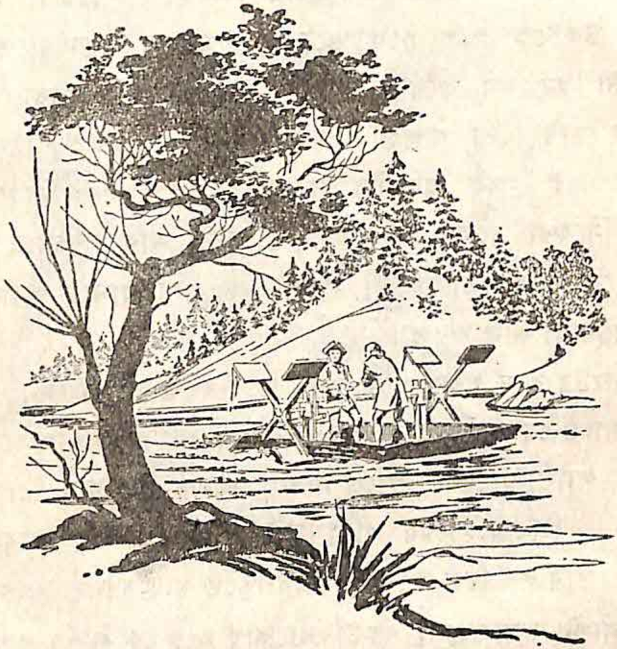
"ইশ অ্যাণ্ড মেসারস্মিথের" কারখানায়। তারা তখন উপনিবেশের সৈন্যদের জন্যে বন্দুক তৈরি আর মেরামতির কাজ করত।

যন্ত্রশিল্পের রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট এই যে একটি মাত্র ছেলেরই সুরক্ষিত বন্দুকের কারখানায় ঢোকবার অধিকার ছিল—তার পক্ষে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার আর কি হতে পারে? হাপরের আগুন টকটকে লাল হয়ে ওঠে। কামারের শক্ত হাতের ঘায়ে নেহাইটা ঝন্ ঝন্ করে। এখানে ওখানে কারিগরেরা বন্দুকের ঘোড়ার ছোট ছোট অংশগুলি জোড়া দিচ্ছে। স্কুলের পাঠ্য বইয়ের চাইতে এই সবই রবার্টের কল্পনাকে বেশী করে নাড়া দিত। ঐতিহাসিকেরা বলেন, সে এত মনোযোগী আর বুদ্ধিমান ছিল যে প্রায়ই সে যেসব মতামত বা নকশা দিত, কারখানার কারিগরেরা সেই অনুযায়ী কাজ করত।

রবার্টের বয়স যখন চোদ্দ তখন তার বন্ধুত্ব হল ক্রিস্টোফার বলে "ইশ্ অ্যাণ্ড মেসারস্মিথে"র আঠারো বছর বয়সের এক শিক্ষানবিশের সঙ্গে। ল্যাঙ্কাস্টারের আশেপাশে অনেক জায়গায় তারা ঘুরে বেড়াত। ক্রিস্টোফারের বাবা পিটার গাম্ফ-এর সঙ্গে প্রায়ই তারা যেত। তাঁর শখ ছিল কনেস্টোগা খাড়িতে মাছ ধরা। এ-সব সময় তারা চ্যাপ্টা তলাওয়ালা একটা নৌকোয় করে বেরোত। রবার্ট আর ক্রিস্টোফার লম্বা লগি ঠেলে ঠেলে মাছ ধরার বিভিন্ন জায়গায় সেটাকে নিয়ে যেত। চলাচলের এই পন্থায় খুব একটা স্বচ্ছন্দগতি ছিল না।

একবার রবার্ট তার মাসীর বাড়ি লিট্‌ল্ ব্রিটেনের ছোট শহরে বেড়াতে গিয়ে দুপাশে দু' চাকাওয়ালা ছোট্ট একটা মাছ ধরবার নৌকোর মডেল তৈরি করল। ল্যাঙ্কাস্টারে ফিরে সে তার

মডেলের মত দুটো চাকা (প্যাড্ল্ হুইল) তৈরি করে পিটার গাম্ফ-এর নৌকার সঙ্গে জুড়ে দিল। চাকার সঙ্গে জোড়া হল দুটো বাঁকান হাতল। সে আর ক্রিস্টোফার হাতল ঘোরালেই নৌকো তর তর করে চলত। এর পর থেকে পিটার গাম্ফ আর এই দুটি ছেলে মিলে



রবার্ট পিটার গাম্ফ-এর নৌকোয় প্যাডল্ হুইল জুড়ে দিল

এই চাকাওয়ালা নৌকোয় করে মাছ ধরতে বেরোত। বহুদিন পর রবার্ট ফুল্টনের বংশের একজন লোক বলতেন যে তাঁর মনে পড়ে রবার্টের তৈরি ছোট্ট মডেলটি তার মাসির বাড়ির বৈঠকখানায় তখনো দেখা যেত।

২

আশাবাদী চিত্রশিল্পী

অনেক বিখ্যাত আমেরিকানদের মতই রবার্ট ফুল্‌টনের ছেলেবেলা কাটে খুব কষ্টের মধ্যে। তার বাবা ছিলেন দর্জি। রবার্ট যখন খুব ছোট তখন তিনি পেনসিলভ্যানিয়ার ল্যাঙ্কাস্টারের প্রান্তে একটা খামার কেনেন। তাঁর জমিটা ছিল অনুর্বর, ফসল হত অতি সামান্য, ফলে তাঁর সমূহ ক্ষতি হয়। তখন তাঁর স্ত্রী তিন মেয়ে আর রবার্টকে নিয়ে তিনি ল্যাঙ্কাস্টারে ফিরে আসেন। সেখানে আবার দর্জির ব্যবসা শুরু করেন। তিন বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। রবার্ট তার মা-বোনেদের ভরণপোষণ করবার মত বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত এই পরিবারকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

যন্ত্রপাতির কাজে দক্ষতা ছাড়া আরো একটা ক্ষমতা রবার্টের মধ্যে ছিল। সে ছবি আঁকতে ভালবাসতো, আর আঁকতোও ভাল। স্কুলে একদিন তার ক্লাসের একটি ছেলে ঝিনুকের খোলায় মেশানো কিছু রঙ নিয়ে আসে। মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধুকে সেই উজ্জ্বল রঙ লাগিয়ে কাগজের ওপর ছবি আঁকতে দেখে রবার্ট বলে, "আমায় খানিকটা রঙ দিবি? একবার ছবি আঁকবার চেষ্টা করে দেখতাম।"

"আগে কখনো এঁকেছিস্?"

"না।"

"আচ্ছা এই নে," প্রতিটি খোলা থেকে একটু করে রঙ নিয়ে বন্ধুটি বলে, "কাজটা মোটেই সহজ নয়।"

বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়ে রবার্ট রঙগুলো লক্ষ্য করে—উজ্জ্বল লাল, নীল আর সবুজ রঙ। এত দামী জিনিস কি কাগজের ওপর নষ্ট করা যায়? তারপর সে আঁকতে শুরু করলো। তার কল্পনা তার তুলিকে চালিয়ে নিয়ে চল্‌লো। ছবি শেষ হতে খুব বেশি দেরী হয় না। ছবিটা এত সুন্দর হল যে, যে ছেলেটি তাকে রঙ দিয়েছিল কেবল সে-ই নয়, ক্লাসের অন্য বন্ধুরাও আশ্চর্য হয়ে যায়। "দেখ দেখ, রবার্ট কি করেছে," বলে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে। ওরা বিশ্বাসই করতে পারে না যে এর আগে রবার্ট কখনো ছবি আঁকেনি।

"এই যে" তার বন্ধু শেষকালে বলে, "আমার সব রঙগুলো তুইই নে। অভ্যেস না থাকাতেই যদি তুই এইরকম আঁকতে পারিস তখন এসব তোরই পাওনা।" আনন্দে দিশেহারা হয়ে রবার্ট রঙগুলো তুলে নেয়, যেন সেগুলো সোনার মতই দামী। বাড়ি নিয়ে এসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছবি আঁকতে লেগে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই তার আঁকা ছবি শহরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকলেই স্বীকার করে যে তার প্রতিভা অসাধারণ। যত দিন যায় সে যত্নের সঙ্গে কাজ করতে থাকে। এ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে তার অনেক কাজে লেগেছিল।

সে সময় রবার্টের বাবার বন্ধু বিখ্যাত প্রতিকৃতি শিল্পী বেঞ্জামিন ওয়েস্ট ল্যাঙ্কাস্টারে থাকতেন। রবার্ট যে সেই সময়েই রঙ তুলি নিয়ে বসবে তাতে হয়তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হয়তো

ওয়েস্টের দেখাদেখিই তার মনে চিত্রশিল্পী হবার বাসনা জাগে। পেনসিলভ্যানিয়ার বাসিন্দারা ওয়েস্টের খুব ভক্ত ছিল।

যাই হোক, খুব অল্প বয়সেই ফুল্‌টন স্থানীয় দোকানের সাইনবোর্ড আঁকতে শুরু করে। এতে পরিবারের সাহায্যের জন্যে সামান্য কিছু টাকাও সে রোজগার করে, এরপর, তখনো তার বয়স অল্পই, সে জেরেমায়া অ্যাণ্ডজ নামে এক ইংরেজ জহুরীর দোকানে



ছোট ছোট ছবি এঁকে সে টাকা রোজগার করে

শিক্ষানবিশের কাজ নেয়। বিপ্লবের সময় তিনি ফিলাডেলফিয়ায় দোকান খুলেছিলেন। তাঁর দোকানে সব রকম অলঙ্কার, ভদ্রলোক আর মহিলাদের জুতোর বক্‌লস, আংটি, লকেট ইত্যাদি বিক্রি হত।

শৌখীন চিত্রকর রবার্ট, জহুরীর দোকানে কি করে কাজ পায়, এ কথা মনে হতে পারে। এর উত্তর হল, তখনকার দিনের বহু-প্রচলিত ফ্যাশান ছিল সোনা-রূপোর লকেট, আর সেই সব লকেট আর আংটির মধ্যে বসান থাকত ছোট ছোট হাতীর দাঁতের টুকরো। ছোট্ট ছোট্ট তুলি দিয়ে ফুল্‌টন হাতীর দাঁতের ওপর সূক্ষ্ম সব প্রতিকৃতি আঁকতো, আর অল্পদিনের মধ্যেই একাজে সে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠল। তার উপার্জিত অর্থ মা-বোনেদের ভরণ-পোষণের জন্যে বাড়ি পাঠিয়ে দিত।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট উনিশ বছরে পা দিলে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ঘন কালো চুল, এমন সুন্দর চেহারা বড় একটা চোখে পড়ে না। গভীর কালো চোখের দৃষ্টি যেন অনেক কিছু বলতে চায়। আস্তে আস্তে সে কথা বলত কিন্তু তার মধ্যে ছিল অনেকখানি আগ্রহ আর বোঝাবার চেষ্টা। এই অল্প বয়সেই তার চেহারা পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বিখ্যাত লোকেদের মত আরো একটা গুণ তার ছিল, সে হ'ল তার শেখবার আর কাজ করবার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে সময়ের কোন হিসেব তার থাকত না। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। রোগটা ফুসফুসের বলে মনে হল। তার অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন কোন অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় যেতে। অতএব রং তুলি নিয়ে রবার্ট গেল পশ্চিম ভার্জিনিয়ার বাথ্‌ শহরে। জায়গাটা তার জলের জন্যে বিখ্যাত। ভূগর্ভের প্রস্রবণের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার জন্যে লোকে এখানে আসত।

বাথ্‌-এ কেবল তার স্বাস্থ্যোন্নতি নয়, ভাগ্যোন্নতিও ঘটল। সেখানকার বড় বড় লোকেরা তার ছবি দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। একজন বললেন, "মিস্টার ফুল্‌টন, আপনার প্রতিভা রয়েছে। আপনার ইউরোপে গিয়ে সবচেয়ে ভাল ভাল শিল্পীদের কাছে কাজ শেখা উচিত। বেঞ্জামিন ওয়েস্টের কাছে আপনার কাজ শেখা উচিত।" মনে আছে বোধ হয় যে ইনিই সেই লোক যিনি রবার্টের জন্মস্থানের কাছেই মানুষ হয়েছিলেন আর রবার্টের বাবার সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল। ওয়েস্ট চিত্রবিদ্যায় এতদূর কৃতকার্য হন আর এত তাঁর খ্যাতি হয় যে তিনি ইউরোপে যান এবং সেখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের, যেমন কাউন্ট, রাজপুত্র, এমনকি তৃতীয় জর্জের পর্যন্ত অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

রবার্ট যখন ফিলাডেল্‌ফিয়াতে ফিরে এল, চেহারা তখন তার স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে পরিপূর্ণ। বড় বড় লোকেদের প্রতিকৃতি আঁকবার সম্ভাবনার তুলনায় লকেটের হাতির দাঁতের ওপর ছোট ছোট ছবি আঁকা যে তার কাছে নীরস মনে হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ইউরোপে যাবার মত টাকা ত তার নেই! বেশ, তাহলে সে তা রোজগারই করবে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বয়স যখন তার কুড়ি, খবরের কাগজে তখন এই বিজ্ঞাপনটি বেরোয়ঃ

> রবার্ট ফুল্‌টন, ক্ষুদ্র-চিত্রশিল্পী, ওয়ালনাট ও সেকেণ্ড স্ট্রীটের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে ফিলাডেল্‌ফিয়ার ফ্রণ্ট স্ট্রীটের পশ্চিমে পাইন স্ট্রীটের একটি বাড়ি পরে স্থান পরিবর্তন করিয়াছেন।

এখানে তার নিজের দোকানে সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ

শুরু করলো। তার দুটি উদ্দেশ্য—এক হল তার মা আর বোনেদের একটি খামার কিনে দেওয়া ; তারপর তাদের স্থিতি হলে নিজের ভাগ্য আর যশের সন্ধানে ইউরোপে পাড়ি দেওয়া।

ঘটনাচক্রে রবার্টের নতুন দোকান ঘরটি জুটেছিল ডিলাওয়্যার নদীর ধার থেকে সামান্য একটু দূরে। সেখানে সেই ক'টি মাস ধরেই জন ফিচ্ নামে একজন আবিষ্কারক তাঁর তৈরি বাষ্পচালিত জলযান-



বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাকে সাহায্য করতে উৎসুক হন

গুলির মধ্যে একটি চালিয়ে দেখছিলেন। এও এক অদ্ভুত যোগাযোগ যে উইলিয়াম হেনরী, যিনি আমেরিকায় সর্বপ্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ তৈরির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান, তিনিও, রবার্ট যেখানে মানুষ হয়, সেই ল্যাঙ্কাস্টারেই বাস করছিলেন।

বাথ্-এ যখন এই তরুণ শিল্পী স্বাস্থ্যের জন্যে বাস করত তখন সেই শহরেই আবার জেম্স্ রাম্জে নামে এক ভদ্রলোকের নক্শা অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে একটি বাষ্পীয় পোতের যন্ত্রপাতি তৈরি

হচ্ছিল। ফুল্‌টন এইসব নৌকোর কোনটি দেখেছিল কিনা তা কখনো জানা যাবে না। হয়ত ফিলাডেল্‌ফিয়ার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে নদীর ধারে গিয়ে মন্থরগতি পালতোলা নৌকো আর বেখাপ্পা চেহারার গাধাবোটের উজানে যাওয়ার দিকে সে তাকিয়ে থাকত। এসব সময় হয়ত সে মনে মনে ভাবত, "একদিন আমিও একটা বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কার করব, হয়ত অন্যেরা যেখানে বিফল হয়েছে আমি সেখানে সফল হতেও পারি।"

হয়তো বা শিল্পী হবার কল্পনাই এসময়ে তার মন জুড়ে ছিল। যাই হোক ১৭৮৬-র হেমন্তে তার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছিল। এই বছরে যখন সে তার নিজের ব্যবসা নিয়েই ছিল তখন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মত কয়েকজন লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়—যাঁরা তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তখন তার পরিবারের লোকেরা তাদের নিজের খামার বেশ ভালভাবে গুছিয়ে নিয়েছে। তার শুধু ইংল্যাণ্ডে যাবার ভাড়াটুকু যোগাড় হলেই হয়। তার ফিলাডেল্‌ফিয়ার বন্ধুরা তাকে শুধু এই টাকাটাই যোগাড় করে দেননি, শিল্পী বেঞ্জামিন ওয়েস্টের জন্যে একটি পরিচয়-পত্রও দেন।

সাগরের অসীম জলরাশির ওপর পূর্বমুখী জাহাজের পাল অনুকূল বাতাসে ভরে ওঠবার সময় রবার্টের উত্তেজনা কল্পনা করা কঠিন নয়। গরীব কৃষি ব্যবসায়ীর ছেলে সে, কিন্তু জীবনের পথে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে—একুশ বছরের তরুণের সামনে পড়ে রয়েছে সারা পৃথিবী। ডেকের ওপর সে দাঁড়িয়ে। পালের দড়িদড়ার ভেতর দিয়ে হু হু শব্দে বয়ে চলেছে বাতাস। দেখতে দেখতে দেশের মাটির শেষ চিহ্নটুকু পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে গেল। রইল শুধু সে আর তার আশা।

৩

আবিষ্কারে মন দিল

দীর্ঘদীন সমুদ্রযাত্রার পর শেষে কুয়াসাচ্ছন্ন ইংল্যাণ্ডের উপকূল দেখা যেতে রবার্ট উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে ঢাক পিটতে শুরু করল। শীগগিরই তার সেই বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। সঙ্গে যে ছবিগুলো নিয়ে এসেছে সেগুলো বেঞ্জামিন ওয়েস্টকে দেখাবে। সে কল্পনা করল মিঃ ওয়েস্ট তাকে বলছেন, "মিঃ ফুল্‌টন্‌, আপনার কাজে অসাধারণ পারদর্শিতা আর কল্পনার পরিচয় দেখা যাচ্ছে! ইংল্যাণ্ডে আপনার অর্থ এমন কি খ্যাতিও হবে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে প্রাচীন ঐতিহ্যময় রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগল। অপরিচিত দেশের দৃশ্য আর নানারকম শব্দে তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অবশেষে সে বেঞ্জামিন ওয়েস্টের দরজায় হাজির হল। তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন-দেখা মুহূর্ত আজ উপস্থিত। বাড়িতে ঢোকার সময় এতই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে তার নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই সচকিত হয়ে উঠল। "মিঃ ওয়েস্ট, আমার নাম রবার্ট ফুল্‌টন। আমার বাবাকে হয়ত আপনার মনে আছে। আমি আমেরিকা থেকে আসছি। আমার বাড়ি

ল্যাঙ্কাস্টারে।" এই সব টুকরো টুকরো কথা। যে কথা সে বলতে চেয়েছিল তা আর মুখ দিয়ে বেরোল না। কম্পিত হাতে সে পরিচয়-পত্রটি মিঃ ওয়েস্টের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

চিঠি খুলতে খুলতে স্মিতহাস্যে বেঞ্জামিন ওয়েস্ট তাকে আশ্বস্ত করলেন। "তুমি ছবি আঁকো শুনে খুসী হলাম বাবা।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ" বলে রবার্ট, সহসা তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। "আমেরিকায় অনেকেই বলেছে যে আমার কিছুটা ক্ষমতা আছে। তাই এখানে এলাম। সঙ্গে কয়েকটা ছবিও এনেছি।" সাগ্রহে সে একটা কেস থেকে তার ছবিগুলো বার করে। মিঃ ওয়েস্ট অল্পকাল সেগুলো দেখে নিয়ে রবার্টের দিকে সোজাসুজি তাকালেন।

তিনি বললেন, "মিঃ ফুল্‌টন, তোমার বন্ধুরা ঠিকই বলেছেন। ক্ষমতা তোমার নিশ্চয়ই আছে। তবে এই ছবিগুলো দেখে এটুকু বলা চলে যে তোমার সম্ভাবনা রয়েছে। এ হল অল্পবয়সের ক্ষমতা। সত্যিকারের ভাল শিল্পী হতে গেলে তোমার হয়ত অনেক বছর সময় লাগতে পারে।"

রবার্টের মুখ রক্তিম হয়ে উঠল, "ভাল একটা ছবি আর মহৎ শিল্প-কর্মে অনেকখানি তফাত" বেঞ্জামিন ওয়েস্ট বলে যান। "কাজ, আরো কাজ—বছরের পর বছর ধরে—তবে তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। আমি খুসী হয়েই সাহায্য করব তবে রাতারাতি অলৌকিক কোন কিছু আশা কোরো না।"

মিঃ ওয়েস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ হয়ে এলে রবার্ট কিছুটা সুস্থ বোধ করল। বড় তীব্র হতাশায় পড়ল সে। সর্বপ্রকার আত্মসম্মান বজায় রেখে মাকে সে লিখল, "গোড়ায় যা ভেবেছিলাম ছবি আঁকা

শিখতে তার চেয়েও কিছু বেশি পরিশ্রম করতে হবে। যা মনে করেছিলাম তার চেয়েও কিছু বেশি দিন আমায় এখানে থাকতে হবে।” সামনে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের দিনগুলি পড়ে। সেই চিন্তায় সে যে কতখানি হতাশ আর ভীত হয়ে পড়েছিল সেটা আমরা কতকটা ধারণা করতে পারি। কারণ ইংল্যাণ্ডে সে অতি অল্প টাকাই নিয়ে এসেছিল আর সে টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করে যে তার থাকা-খাওয়া চালাবে সে সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না।

“ইংল্যাণ্ডে ৪০ গিনির বেশি নিয়ে আমি আসিনি,” পরে সে দেশে চিঠি লেখে, “আর বিদেশে নির্বান্ধব অবস্থায় মিঃ ওয়েস্টের কাছে একটি পরিচয়-পত্র মাত্র সম্বল করে এসে পড়েছি। এখানে একটি শিল্পকর্ম শিখে আমায় রোজগার করতে হবে, কিন্তু শেখবার সময়টুকুর খরচ চালানোর মত বিশেষ সম্বল আমার নেই। তারপর এই ব্যবসায়ে অনেকগুলি বিখ্যাত ব্যক্তির চেয়ে ভাল কাজ করলে তবে আমি বাঁচতে পারব। অনেক নিঃসঙ্গ সময় আমি কাটিয়েছি…দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত অবস্থায় কাজ করেছি আর ভেবেছি আমার খরচ চালানোর মত টাকা কেমন করে যোগাড় করব।”

ফুল্‌টনের মত অবস্থায় পড়লে আমরা অনেকেই হয়তো ঘরে ফিরে আসতাম, চেনা মুখ আর জানা কাজের মধ্যে—যে কাজে নিশ্চিত জানা যে খাওয়া-পরাটা জুটবে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে হতাশ হয়ে থাকা বা অসুবিধের জন্যে কাজ ছেড়ে দেওয়া রবার্টের স্বভাবে ছিল না। চার বছর ধরে সে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, দরকারের সময় টাকা ধার করত আর কোন ছবি বিক্রি হলেই তা শোধ করত।

ক্রমে অভিজাত সম্প্রদায়ের জনকয়েক লোকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল। তাদের ছবি সে এঁকেছিল। পরে লণ্ডনের সাধারণ প্রদর্শনীতে ছবি দেখাবার সৌভাগ্যও তার ঘটে আর দু'খানা ছবি



লণ্ডনে রবার্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের ছবি আঁকে

রয়্যাল অ্যাকাডেমিতেও গৃহীত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে সে বাড়িতে লিখল যে ধার শোধ করার মত টাকা সে সবে রোজগার করতে শুরু করেছে। মাস ছয়েকের মধ্যেই তার দেনাপত্তর সব শোধ হয়ে যাবে; তখন সে টাকা জমাতে পারবে।

কিন্তু অবশেষে বয়স যখন তার প্রায় ত্রিশ তখন সে বুঝতে পারল যে ছবি এঁকে যা সে পাবে বলে মনে করেছিল তা কোন দিনই পাওয়া যাবে না। মনের দুঃখে একাজ সে ছেড়ে দিল। তার শৈশবের স্বপ্ন যে তার ছবি একদিন সমস্ত শিল্পজগতের প্রশংসা অর্জন করবে—তা কুয়াসায় বিলীন হয়ে গেল। সে দেখল যে যশ আর অর্থলাভের পথে দশবছর আগেও সে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তবু উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ তার মন, তূণ থেকে আরো তীক্ষ্ণ বাণ তুলে নেয়। তার নতুন লক্ষ্য হল বিস্ময়কর আবিষ্কারের জগৎ। যন্ত্রপাতির প্রতি তার আকর্ষণের কথা কি সে ভুলে গেছে—ছেলেবেলার সেই বন্দুকের কারখানা যেখানে সে নিত্য যেত—পিটার গাম্ফের মাছ ধরার নৌকোয় সেই যে চাকা লাগিয়েছিল?

তার এতকালের শিল্পীজীবনের মধ্যে কেমন করে তার আবিষ্কারের উদ্যম সুপ্ত ছিল? তা জানার কোন উপায় নেই, তবে একথা আমরা জানি যে রবার্ট এক সময় যেমন তুলি হাতে নিয়েছিল ঠিক সেইরকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এখন সে নক্‌শা করার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসল। মার্বেল কাটার একটি যন্ত্র সে আবিষ্কার করল। এর জন্যে পুরস্কার লাভ হল একটি স্বর্ণ পদক। দড়ি পাকাবার একটি যন্ত্র তৈরি করল আর শণ বোনবার যন্ত্রের সে পেটেন্ট পেল। খাল

সম্পর্কে একটি বই সে লিখে ফেলল আর সেই সঙ্গে এতে মাল চলাচল করবার কয়েকটি যন্ত্রও সে আবিষ্কার করল।

খাল আর খালের নৌকো থেকে তার চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে চলল কি করে নৌকোকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে চালান যায় সেদিকে, আর ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন তৈরির সম্ভাবনাও তার মনে উদয় হল। এখন সে জীবনের এক উত্তেজনাময় মুহূর্তে এসে উপস্থিত হল। আমেরিকান পথিকৃৎদের অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল বনের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার মতই উত্তেজনাময়। বাষ্পচালিত জাহাজের লোভনীয় সম্ভাবনা, সমুদ্রের তলায় চলতে পারে এরকম একটা জাহাজ তৈরি করার মত কৌতূহলোদ্দীপক কাজ নয়। এরকম যন্ত্র তৈরি করতে পারলে এমন এক অস্ত্র তৈরি হবে যাতে সমস্ত নৌবহরকেই ভীতি-প্রদর্শন করা চলবে। শুধু সাবমেরিন দিয়ে অবশ্য কিছু ধ্বংস করা যায় না। কিন্তু মাথায় তার আর একটি জিনিস আবিষ্কারের ঘুরছিল যেটি সাবমেরিনে বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে—টর্পেডো।

রবার্ট ভাবল যদি সে সাফল্যের সঙ্গে সাবমেরিন তৈরি করতে পারে তবে এই আবিষ্কারের ফলে সমস্ত যুদ্ধই বন্ধ হয়ে যাবে কারণ শত্রু পক্ষের ডুবোজাহাজের কাছে কোন নৌবহরেরই আর নিরাপত্তা থাকবে না। ফলে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। সে ভাবল এইভাবেই সে পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে সমর্থ হবে।

১৭৯৭ সালের সাধারণ মানুষের কাছে সাবমেরিন বা টর্পেডোর কথা, আমাদের কাছে মহাশূন্য যান বা উড়ন্ত চাকতির মতই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু দীর্ঘপথ জলের তলায় চলবার মত সাবমেরিন আর বিস্ফোরণযোগ্য টর্পেডো তখন আবিষ্কৃত হবার মুখে—আর তার আবিষ্কর্তা হবে রবার্ট ফুল্‌টন।

৪

ডুবোজাহাজের আবির্ভাব

একটুকরো কাঠের মত পালতোলা জাহাজটা ইংলিশ চ্যানেলে দুলছে। তাতে অনেকগুলি ফরাসী। ইংল্যাণ্ড থেকে উঠে অবধি তারা তাদের নিজের ভাষায় বক্ বক্ করে চলেছে। রবার্ট ফুল্টন তার একবর্ণও বোঝেনি, ইংল্যাণ্ডে আসবার ব্যবস্থা করতেই তার বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে। এখন সে ভাগ্যের অনুসন্ধানে নতুন দেশে চলেছে, হয়ত বা ভুলই করল। এই লোকগুলো ইংরেজদের থেকে এত ভিন্ন ধরনের। তাদের কথা বুঝতে না পেরে তার মনে এক বেদনাদায়ক অনুভূতি এল—জগতে সে কতখানি একা!

তবু ফ্রান্স আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে এক সহানুভূতির বন্ধন, কারণ দুই রাষ্ট্রেই সাধারণতন্ত্র বর্তমান। বাতাসে স্বাধীনতার আভাস। আমেরিকান হিসেবে ফুল্টন রাজতন্ত্রী ইংল্যাণ্ডের চাইতে সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের সঙ্গে অনেকখানি একাত্মবোধ করে। ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে ত আমেরিকা সদ্য তার স্বাধীনতা লাভ করেছে। ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডে তীব্র শত্রুতা। ফুল্টনের মনে হল তার ডুবো-জাহাজের পরিকল্পনায় ফরাসী সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তাকে বেশী বেগ পেতে হবে না।

চিন্তামগ্ন অবস্থায় ডেকে সে দাঁড়িয়ে। একজন ফরাসী এসে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। রবার্ট দিশেহারা হয়ে গেল। তার মাথা যতই গুলিয়ে যায়, ফরাসীটি ততই হাতমুখ নেড়ে তড়বড় করে কথা বলতে থাকে। এই সময় এগিয়ে এল একটি ভারী সুন্দরী মেয়ে—জাহাজের আর পাঁচজনের মত তাকে মোটেই মনে হয় না। পরিষ্কার ইংরিজিতে ফরাসীটি কি চায় তা রবার্টকে বলল। তারপর রবার্টের জবাব সে ফরাসীতে তর্জমা করে দিল। ফরাসীটি খুসী হল, আর রবার্ট যে মেয়েটির কাছে শুধু মাত্র কৃতজ্ঞ হয়ে রইল তা নয়, ওর পরিচয়টি আরো ভাল করে জানবার তার ভারী ইচ্ছে হল।

জাহাজ ক্যালেতে পৌঁছলে আবার তাকে ফরাসী কর্মচারীর প্রশ্নের মুখে পড়তে হল। মেয়েটি আবার হাসিমুখে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ওর কাছ থেকেই সে জানতে পারল যে তার কাগজপত্রে কিছু গোলমাল আছে। প্যারিসে যাবার আগে তাঁকে ক্যালেতে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকতে হবে। যদিও মেয়েটির সঙ্গে রবার্টের আগের দিন মাত্র পরিচয় হয়েছে তবু ওর জন্যে তার মাথা থেকে আবিষ্কারের চিন্তা উবে যাবার উপক্রম হল। ওর সম্বন্ধে আরো খবর জানবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হল, কারণ এখনো পর্যন্ত ওর নামটুকুও সে জানতে পারেনি।

প্রথমে ও তো কিছুতেই বলতে চায় না, কিন্তু শেষে বললে যে ও হচ্ছে মাদাম ফ্রাঁসোয়া, এক দোকানদারের স্ত্রী, এখন দেশে স্বামীর কাছে ফিরছে। রবার্ট মুষড়ে পড়ল। কিন্তু ক্যালেতে থাকতে থাকতে ক্রমে কিছুতেই তার আর বিশ্বাস হচ্ছিল না যে ও বিবাহিতা। মেয়েটি সুন্দরী আর এত অল্প বয়স। আর ওর মধ্যে

এমন একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে যে একটা সামান্য দোকানদারের সঙ্গে ওর কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না। সম্ভবত ও ফরাসী অভিজাত বংশের মেয়ে, এতদিন কোন মতে জল্লাদগুলোর হাত এড়িয়ে রয়েছে।

তারপর সে জানতে পারল যে মেয়েটি বিপন্ন—ওকে হোটেলের একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে আর ফরাসী কর্মচারীরা ওর ওপর নজর রাখছে। ওর ঘরে ছুটে গিয়ে রবার্ট রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল ঃ

"মাদাম ফ্রাঁসোয়া শুনুন, আপনি ভয়ানক বিপদে পড়েছেন। আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পারি।"

"অজস্র ধন্যবাদ" মাদাম ফ্রাঁসোয়া বলেন, "কিন্তু দয়া করে একটু খুলে বলুন কি করতে চান।"

"ওরা আপনাকে প্যারিসে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে। আর ওখানে একবার গেলে আর রক্ষা নেই। এখন আমি যা বলি শুনুন। পালানো খুব সোজা। অত্যন্ত সহজ, আমাকে বিয়ে করে ফেলুন—সত্যি বলছি বিয়ে করুন।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু আমার যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

"ওঃ কি লজ্জা, কি লজ্জা।" রবার্ট গুম্‌রে উঠল। "আমি আপনাকে অনেক অর্থ দিতে পারতাম। প্যারিসে যাচ্ছি প্রচুর উপার্জনের জন্যে।" সাবমেরিন, টর্পেডো, আর আরো অনেক আবিষ্কারের কথা গড়গড় করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। "কত সহজে আপনাকে উদ্ধার করতে পারতাম,"—সে মিনতি করে বলল। "কেবল বলুন যে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন, তাহলেই সমস্ত বিপদ থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন।"

রবার্ট মেয়েটিকে বড়ই ভালবেসে ফেলেছিল, কিন্তু আবার তাকে হতাশ হতে হয়। তখন সে তা জানতে না পারলেও মেয়েটি কিন্তু সত্যিই ফরাসী অভিজাত বংশের এবং অবিবাহিতা ছিল। তখনকার মত ও বিপদেও পড়েছিল কিন্তু জানত যে শীগ্গীরই ও মুক্তি পাবে। এরকম হঠাৎ এবং এত গভীর ভাবে যে প্রস্তাব সে করে ফেলে, মেয়েটি তা অত্যন্ত হাল্কাভাবেই নিয়েছিল। রবার্ট ফুল্টনের সঙ্গে অজানা ভবিষ্যতের দিকে ছুটে যেতে তার কোনই বাসনা ছিল না।

পরে সে লেখে, "যতদূর পারি ততদূর গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, তার ছোট্ট মতলবটি তার কাছে খুব সোজাই মনে হয়েছিল। আর সে এতখানি দয়াপরবশ হয়ে আর এমন আন্তরিকতার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবটি করে বসল যে হেসে ফেললেও আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব না করে পারিনি। আমার সম্বন্ধে আর তাকে দুশ্চিন্তা না করতে তাকে অনুরোধ করি……সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদায় নিল।"

অপদস্থ রবার্টের তার বোনেদের সঙ্গে তাল রেখে চলবার সুযোগটি ফস্কে গেল। তাদের এখন বিয়ে-থাওয়া হয়ে ছেলেপুলে হয়ে গিয়েছে। মামা সে এখন অনেকেরই কিন্তু কারো বাবা হতে পারেনি। "যাই হোক" বাড়িতে সে লেখে, "এখনো আমি ছাতা-পড়া বুড়ো হয়ে যাইনি, হয়তো আরেক সময় চেষ্টা করে দেখা যাবে কি হয়। তবে এখন অবশ্য তার কোন সুদূরতম সম্ভাবনাও নেই।"

তার কাগজপত্র ঠিক হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রবার্ট প্যারিসে যাত্রা করলো। সেখানে জোয়েল বার্লো নামে একজন আমেরিকান

রাজনীতিবিদ্ তাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করলেন। বার্লো আর তাঁর স্ত্রী ফ্রান্সে বেশ কিছুদিন যাবৎ বাস করছিলেন। এতবছর পরে এঁদের কাছেই ফুল্‌টন সর্বপ্রথম বাড়ির লোকের মত যত্ন পেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে তার খালের পরিকল্পনার দিকে ফরাসী এঞ্জিনীয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। এর ফলে ফ্রান্সের সবচেয়ে ছোট্ট গ্রামের সঙ্গে সবচেয়ে বড় শহরের যোগাযোগ সম্ভব হত। এগুলি সহানুভূতির সঙ্গে আলোচিত হলেও এ নিয়ে বেশি কিছু করা হয়নি। ডুবোজাহাজের কথাতেই ফরাসী রাজকর্মচারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল, আর এই ডুবোজাহাজই রবার্টের সমস্ত চিন্তা জুড়ে রইল।

সাঁতারু মাত্রেই জানে যে দম বন্ধ করে রাখলেই ভেসে থাকা যায়। একটু নিঃশ্বাস ছাড়লেই সে ডুবতে শুরু করে! তার মানে হল, যে-জলের ওপর সে এতক্ষণ ভেসে ছিল সেটার চেয়ে তার ওজন ভারী হয়ে গিয়েছে। সেই ভাবেই ফুল্‌টনও দেখল যে এমন একটা নিশ্ছিদ্র জাহাজ তৈরি সম্ভব যেটার আপেক্ষিক ওজনের ওপর নির্ভর করবে—সেটা ভাসবে বা ডুববে। প্রধান সমস্যা হল মাঝিমাল্লারা তার ভেতর থাকবার সময় তার ওজন পরিবর্তন করা। রবার্ট যে ছোট্ট মডেলটি তৈরি করছিল তাতে জল নেবার চৌবাচ্চা লাগিয়ে এর সমাধান করল। ডুবো জাহাজের নাবিকরা জলের নিচে যেতে চাইলে সেই চৌবাচ্চায় জল ঢুকিয়ে দিলেই হল। যদি ভেসে উঠতে চায় কেবল চৌবাচ্চা থেকে জল পাম্প করে দিয়ে সেই সঙ্গে একটা হাতল ঘুরিয়ে জাহাজের মাথায় বসান একটা প্রপেলারকে ঘোরালেই হবে। এতে জাহাজটা সোজা উঠে পড়বে, অনেকটা আজকের হেলিকপ্টারের রোটরের মত।

মাল্লাদের হাওয়া-বাতাসের জন্যে সে একটা "কনিং টাওয়ার" বা নল জলের ওপর উঁচু করে রাখবার ব্যবস্থা করল। তাতে ভেতরকার হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা হবে। ভেতর থেকে হাতল ঘুরিয়ে আর একটা প্রপেলার চালাবার ব্যবস্থা হল যাতে ডোবা অবস্থায় জাহাজটা সামনের দিকে এগোতে পারে, আর জলের ওপরে ভাসমান অবস্থায় চলবার জন্যে হল পালের ব্যবস্থা। অবশেষে ১৭৯৮ সালে রবার্ট তার মডেলটি শেষ করল। তার চেহারাটা দাঁড়াল এ যুগের চুরুটের গড়নের গ্যাস বেলুনের মত।

এখন কি তাকে ডুবো জাহাজের আবিষ্কর্তা বলা যেতে পারে ? ঠিক তা বলা চলে না ; কারণ ডেভিড বুশ্‌নেল বলে আর একজন আমেরিকান এর আগে জলের তলায় চলার মত একটি যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। কতকগুলি বিষয়ে এটি ফুল্‌টনের থেকে অন্য ধরনের হলেও অন্যান্য সব বিষয়ে সেটা একই ছিল। একজনের মাথা থেকে সম্পূর্ণ একটি আবিষ্কার ক্বচিৎ কখনো হতে দেখা যায়। বরং সাধারণত এসব ক্রমে ক্রমেই তৈরি হয় ; এখানে একটা ধারণা বা আইডিয়া, ওখানে একটা আইডিয়া, এই সব জুড়ে মূল পরিকল্পনাটি তৈরি হয়। আর যতক্ষণ না কেউ তৈরি করে দেখাচ্ছে যে সেটায় কাজ হয় ততক্ষণ জিনিসটা আবিষ্কারই হল না। তাই ছিল রবার্ট ফুল্‌টনের লক্ষ্য।

এ পর্যন্ত তার কেবল একটি মডেল মাত্র সম্বল। এখন সেটা সে ফরাসী সরকারকে দেখাবার চেষ্টা করল। যা ভেবেছিল ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক কঠিন দেখা গেল। ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ফলে দেশময় দুশ্চিন্তা আর অশান্তি। নেপোলিয়ন প্রায়

ক্ষমতা অধিকার করতে চলেছেন। তখনো রবার্ট মনে করত তার ডুবোজাহাজটি শান্তির অস্ত্র। এক চিঠিতে সে নেপোলিয়নকে লিখল যে পৃথিবীর শক্তিশালী নৌবহরগুলি, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের নৌবহর বিভিন্ন জাতির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ব্যাহত করছে। তার মনে হয় যে ডুবোজাহাজের ফলে সমুদ্রে একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান হবে। এই সমুদ্রগর্ভগামী জাহাজ যখন রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে শত্রুপক্ষের নৌবহরের মধ্যে উপস্থিত হতে পারে তখন কোন নৌবহরই আর নিরাপদ নয়।

অবশেষে ফরাসী সরকার ফুল্‌টনের মডেলটি দেখবার জন্যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করলেন। কয়েকটি জিনিসের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও বিশেষজ্ঞরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন যে রবার্ট "একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি"। তাঁরা তার অস্ত্রটির বর্ণনা দিলেন, "ধ্বংসের সাংঘাতিক উপায়, কারণ এর কাজ হয় নিঃশব্দে।" কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ব্রিটিশ নৌবহর আক্রমণ করার জন্যে এই জাহাজ তৈরি করার সময় সরকারের তখনো আসেনি বলে তাঁরা মনে করেন।

তাঁরা বলেন যে ফুল্‌টনকে প্রথমে পুরোমাপের একটি ডুবোজাহাজ তৈরি করতে হবে। তারপর তাকে মাল্লা হিসাবে দু'একজন সঙ্গী বেছে নিয়ে জলের তলায় এটি চালানো অভ্যাস করতে হবে। শত্রুপক্ষের জাহাজের তলায় টর্পেডো লাগাবার একটি ভাল উপায় বার করা তার এখনো বাকী। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এ সব করতে সময় লাগবে। কিন্তু যাই হোক, তাঁদের মতে পুরোমাপের একটি

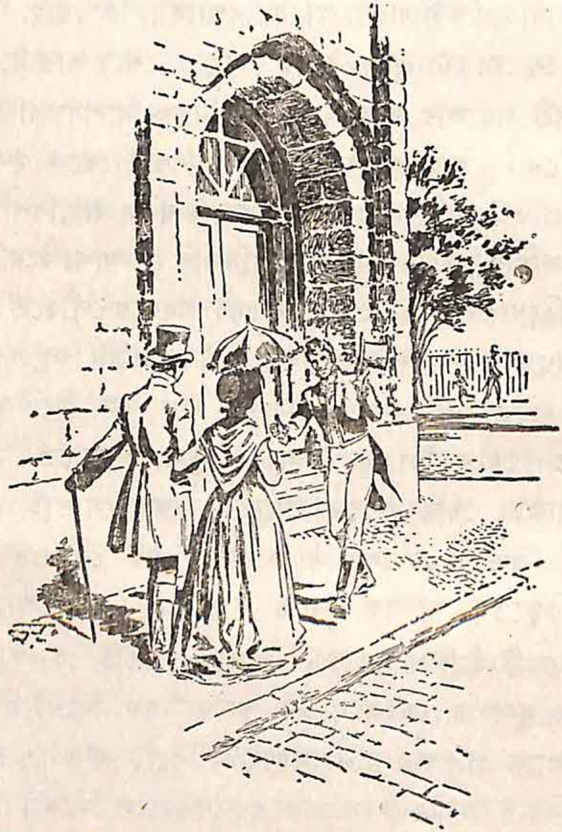
ডুবোজাহাজ তৈরি করার জন্যে সরকারের ফুল্‌টনকে অর্থসাহায্য করা উচিত।

কিন্তু ফরাসী সরকার তবুও রবার্টকে তার জাহাজ তৈরির জন্যে অর্থসাহায্যের কোন ব্যবস্থা করলেন না। তিক্ত মনে রবার্ট ভাবলে, "কারো মাথায় একটা ধারণা আসে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ধরে সে লোকটা নক্‌শা তৈরি করে। শেষে তার মডেল তৈরি হয়। সেটি পরীক্ষার জন্যে সরকারের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা এসে দেখে পছন্দ করেন। তারপর সরকার সেই আবিষ্কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।" প্রতিটি আবিষ্কর্তার পথেই কি এই রকম বাধাবিপত্তি আসে? প্রথমে চিত্রশিল্পী হিসাবে জগতে যে প্রতিপত্তি সে আশা করেছিল, আজ যন্ত্রশিল্পী হিসেবেও কি সে কোনদিন সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারবে?

নিজের ভাগ্যকে শুধু ধিক্কার দিয়ে কেউ কোনদিন কিছু করতে পারে নি। একমাত্র করণীয় হল কর্মহীনতার সঙ্গে কর্ম দিয়ে যুদ্ধ করা। কোনমতে—কোন উপায়ে টাকা সে তুলবেই যাতে নিজেই সে ডুবোজাহাজটা তৈরি করতে পারে। এখন সে তাই করতে শুরু করলে। কিভাবে যে রবার্ট তা করেছিল সেটি তোমার জানা না থাকল কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না। সে "প্যানোরামা" নামের একটি ইংলিশ পেটেন্ট কিনল। একটি কোম্পানি তৈরি করে সে বুলভার মোঁমার্ত্র-এর কাছে এক থিয়েটার বানাল। অল্পদিন আগে রাশিয়ার মস্কো শহরে যে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয় তারই বিরাট বিরাট ভিত্তিচিত্র সে ভেতরের দেওয়ালে আঁকল। শহরের রাস্তা দিয়ে, শত সহস্র জানালার ভেতর দিয়ে অগ্নির লেলিহান শিখা সে এমন সজীব আর নাটকীয় ভাবে আঁকল যে সারা প্যারিস ভেঙ্গে

লোকে সেই প্রদর্শনী পয়সা দিয়ে দেখতে এল। এই ভাবে সে তার ডুবোজাহাজ তৈরির টাকা তুলল।

এই সময় একদিন প্যারিসের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রবার্ট হঠাৎ একটি পরিচিত সুন্দর মুখের সাক্ষাৎ পেল। সে হল মাদাম



প্যারিসের এক রাস্তায় রবার্ট আবার মাদাম ফ্রাঁসোয়ার দেখা পেল

ফ্রাঁসোয়া, সেই যে মেয়েটি ফ্রান্সে প্রথম আসার সময় তার

কাগজপত্রের ব্যাপারে সাহায্য করে। সে আর তার সঙ্গীর দিকে ছুটে গিয়ে রবার্ট তার ছুটি হাত জড়িয়ে ধরল।

"মাদাম ফ্রাঁসোয়া, আপনাকে দেখে কি যে আনন্দ হল!" তার নাম কিন্তু মোটেই মাদাম ফ্রাঁসোয়া নয়। তবে এ সেই মেয়েটিই বটে, আর তার ভগ্নীপতির সঙ্গে বেড়াবার সময়েই রবার্ট তাকে দেখতে পায়। তার ভগ্নীপতি রবার্টের সঙ্গে তার পূর্বসাক্ষাতের ব্যাপার জানতেন না। তিনি বললেন ঃ

"মঁসিয়, আপনি যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি হলেন মাদমোয়াজেল দ্য মোঁতো।"

"না না!" রবার্ট প্রতিবাদ করে, "উনি মাদাম ফ্রাঁসোয়া। আমায় ক্যালেতে বললেন যে উনি বিবাহিতা। কিন্তু আপনি কি বললেন মাদমোয়াজেল কি? মাদমোয়াজেল দ্য মোঁতো?" একটুকরো কাগজ বার করে সে লিখে নিল "মাদমোয়াজেল দ্য মোঁতো", তারপর কাগজটা পকেটে পুরল। তারপর সে তার আবিষ্কারের কথা বলতে শুরু করল। "মঁসিয়, আমি এক অদ্ভুত কাজ নিয়ে প্যারিসে এসেছি—জাহাজ উড়িয়ে দিতে, নদীর তলা দিয়ে জাহাজ চালাতে আর নদীর ওপরে বাষ্পের সাহায্যে জাহাজ চালাতে।"

"আমার ভগ্নীপতি," মাদমোয়াজেল দ্য মোঁতো অনেকদিন পরে বলতেন, "ভাবলেন লোকটা একদম পাগল, আর তাড়াতাড়ি এসব আলাপ বন্ধ করে দিলেন। তারপর আর ওকে দেখিনি।"

এক দুঃসাহসিক সমুদ্র-যাত্রা

আগে যা কখনো তৈরি হয়নি এমন কোন জিনিস আজও যদি তৈরি করতে যাও ত তার অনেকখানিই করতে হবে হাতে করে। তবু কাজের জন্যে এখন ভাল ইস্পাত পাওয়া যায় আর বিভিন্ন অংশগুলি গড়ে নেবার মত নানা রকম যন্ত্রপাতিও রয়েছে। তার ডুবোজাহাজের অংশগুলি তৈরি করবার জন্যে রবার্টকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কামারের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কামার আজকাল বিশেষ আর দেখা যায় না, তবে যদি কখনো দেখে থাক তো নিশ্চয়ই জান যে হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে কোন জিনিস গড়ে তোলা কি ক্লান্তিকর কাজ। তারপর আবার সেটি হাপরে বসিয়ে লাল করা যাতে আবার পিটিয়ে গড়নটা ঠিক করা যায়।

ভেবে দেখ একবার যে রবার্টের ডুবোজাহাজ তৈরি করতে কিভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে—কত সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে আর কত ভুল শোধরাতে হয়েছে। আজকের সাবমেরিনের তুলনায় তারটা এক হাতে চালান ক্র্যাঙ্ক আর প্রপেলার লাগানো খেলনা মাত্র। কিন্তু এই ছিল আজকের শক্তিশালী সাবমেরিনের পূর্বগামী, যেমন রাইট ভাইদের পল্‌কা উড়বার যন্ত্রটি সমস্ত উড়োজাহাজের প্রপিতামহ।

রুয়ঁতে পেরিয়ের কারখানায়, যেখানে তার জাহাজটি তৈরি হচ্ছিল সেখানে, রবার্ট সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকত। ক্রমে ক্রমে ওটা গড়ে ওঠে; শেষে ১৮০০ সালের একদিন এর তরুণ নির্মাতা সগর্বে বলতে পারলো যে কাজ শেষ হয়েছে। ফরাসী সরকার তাকে কোন সাহায্য করেন নি, তবে একটি সরকারী কমিটিকে জাহাজের পরীক্ষামূলক যাত্রাটি পরিদর্শনের জন্যে সানন্দে নিযুক্ত করেন।

অনেকেই শুনলে যে নটিলাস্—(রবার্টের দেওয়া সাবমেরিনটির নাম) জুলাই মাসে পরীক্ষা করে দেখা হবে। পরীক্ষার নির্ধারিত দিনে সকাল থেকেই সেন নদীর ধারে লোক জমা হতে লাগল। নটিলাস্ জলে ভাসছে আর দুজন নাবিক নিয়ে রবার্ট জলের নিচে নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। অবশেষে সরকারী পরিদর্শকমণ্ডলী এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে মিঃ ফোরফে, নেপোলিয়নের মন্ত্রিসভার নৌ-বিভাগের মন্ত্রী।

পরীক্ষামূলক যাত্রার পূর্বমুহূর্তে রবার্ট বলল, "আমরা এবার নটিলাসের মধ্যে ঢুকব। নদীর একেবারে নিচে নেমে পঁয়তাল্লিশ মিনিটকাল থাকব। এই পরীক্ষার ফলে প্রমাণ হবে যে এই জাহাজে দীর্ঘকাল সমুদ্রের তলায় থাকা যায়। এখানে নদীর গভীরতা না থাকায় আমরা জলের তলায় চলাফেরা করতে পারব না। যাই হোক আমরা আশা করি যে জলের তলায় স্বচ্ছন্দে অদৃশ্য থাকতে পারে এমন জাহাজের মূল্য সবচেয়ে সন্দেহবাদী দর্শকের কাছেও পরিষ্কার হবে।"

নদীতীরে জনতার মধ্যে এতটুকু ফিস্‌ফিসানির শব্দও শোনা

যায় না। দুজন নাবিক আর তাদের পেছনে রবার্ট নটিলাসে ঢুকে বেরুবার দরজাটি বন্ধ করে দিল। ভাসতে ভাসতে গভীর জলের কাছে গিয়ে এই অদ্ভুত যন্ত্রটি থামল। তারপর কয়েক মুহূর্ত পরে ওটা ডুবতে শুরু করল। ক্রমে ওপরকার উঁচু জায়গা, যেখানে বেরুবার দরজাটা রয়েছে, সেটুকু ছাড়া কিছুই আর দেখা যায় না। কয়েক সেকেণ্ড বাদে সেটুকুও অদৃশ্য হল। দর্শকবৃন্দ ঘাড় টান করে রইল। তাদের নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

"আহাম্মকী কাণ্ড," একজন বলে উঠল।

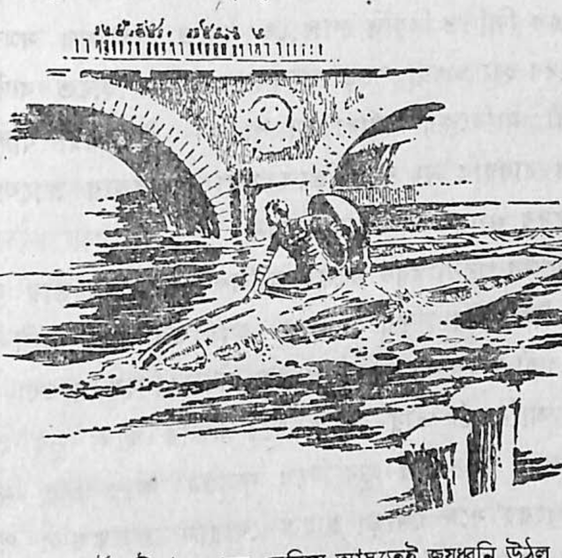
"ওরা ইঁদুরের মত ফাঁদে আটকা পড়ল।" আরেকজন মৃদু কণ্ঠে বলল।

মিনিটের পর মিনিট চলে যায়। নটিলাস যেখানে ডুবেছিল সেখানে কোন নড়াচড়ার চিহ্নমাত্র নেই। এই অদ্ভুত জাহাজের যাত্রীদের সম্বন্ধে আশাও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। যখন সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেল আর ডুবোজাহাজটির কোন চিহ্নও দেখা গেল না, সরকারী পরিদর্শকরা তখন গম্ভীর মুখে পরস্পরের দিকে তাকালেন। কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে নিম্নস্বরে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলতে লাগলেন। জনতা নিস্তব্ধ।

তখনই নটিলাস যেখানে ডুবেছিল সেখানে বুদ্বুদ উঠতে দেখা গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ছাইরঙের কি যেন একটা চোখে পড়ল। নদীর তীর থেকে একটা চীৎকার উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নটিলাসকে পূর্ণভাবে দেখা গেল। হঠাৎ ওপরের দরজাটা খুলে গেল ; আর রবার্ট ফুল্‌টনের লম্বা ছিপছিপে চেহারাটা নজরে পড়ল ! তীর থেকে জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। সরকারী পরিদর্শকরা

এবার নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে লাগলেন। এ জিনিস চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ডুবোজাহাজ যে সমুদ্রের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

এর আবিষ্কর্তা আর নাবিক দুজন তীরের কাছে আসতেই সকলের চোখ গিয়ে পড়ল তাদের ওপর। রবার্টের মুখ স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল, যেন গর্বমিশ্রিত বিনয়ের প্রতিমূর্তি। নৌ-বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ফোরফে বললেন, "মঁসিয়, আপনার যন্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। এ এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম।"



রবার্ট নটিলাস থেকে বেরিয়ে আসতেই জয়ধ্বনি উঠল

খেলায় বিজয়ী বীরের মত আনন্দ আর ক্লান্তি নিয়ে সে রাত্রে রবার্ট বাড়ি ফিরল। নৌ-বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় নেপোলিয়নকে

নটিলাস সম্বন্ধে খুব উৎসাহজনক রিপোর্ট পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছেন। মনে হ'ল মিঃ ফোরফের দৌলতে আরো পরীক্ষা চালাবার জন্যে ফরাসী সরকারের কাছ থেকে ৬০০০ ফ্রাঁ ধার অবশ্যই পাওয়া যাবে। যদিও রবার্ট নিজে যে ২৮০০ ফ্রাঁ খরচ করেছে এ তার অতি সামান্য অংশমাত্র, তবু কিছু না-পাওয়ার চাইতে তো ভাল। আর পরে হয়ত সরকারের কাছ থেকে আরো টাকা পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আবার তার কপালে আশাভঙ্গ আছে। হপ্তার পর হপ্তা কেটে গেল, সরকার কিছুই করলেন না। রবার্ট কেবল নেপোলিয়নের কাছ থেকে এক লিখিত বিবৃতি পেল যে সমুদ্রে পরীক্ষার সময় সে যদি ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে তবে শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী যে কোন ফরাসী নাবিকের মর্যাদা সে পাবে। ইংরেজরা যদি তার সঙ্গে সেভাবে ব্যবহার না করে তবে ফরাসী সরকার ফ্রান্সে ধৃত ইংরেজ বন্দীদের ওপর প্রতিশোধ নেবেন।

রবার্ট নিজের পয়সা খরচ করেই ইংলিশ চ্যানেলে তার ডুবো-জাহাজটি পরীক্ষা করা স্থির করল। জাহাজটা সেন নদী দিয়ে সমুদ্রের তীরবর্তী বন্দর ল্য হাভ্‌র্ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে এর আবিষ্কর্তা তীর থেকে দূরে গভীর জলে ডুব দেওয়া অভ্যেস করল। বার-বার ডুব দিয়ে ফুল্‌টন আর তার নাবিক দুজন প্রপেলারের সঙ্গে জোড়া হাতে ঘোরান ক্র্যাঙ্কগুলি পরীক্ষা করে দেখল আর টর্পেডোগুলোও নিখুঁত করল। এই সময়েই সে তিনজনে মিলে ইংরেজ নৌবহর আক্রমণ করা স্থির করল। আজকে কথাটা অবশ্য উদ্ভট বলে মনে হবে। ফরাসী গোয়েন্দা

বিভাগের সাহায্যে ইংরেজ জাহাজগুলি কোথায় নোঙর করে আছে সে খবর যোগাড় করার মতলব করল। তারপর সে সদলে একদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে সেগুলির কাছে গিয়ে পৌঁছবে। পথটুকুর অধিকাংশই জলের ওপর দিয়ে ভেসে যাবে।

যে বন্দরে ইংরেজ জাহাজগুলির নোঙর করে থাকার কথা তার ঠিক বাইরে এসে সাবমেরিনটি ডুব দিয়ে গোপনে তীরের কাছে গিয়ে একটি ইংরেজ মানোয়ারী জাহাজের পাশে এসে উপস্থিত হবে। তখন ফুল্‌টন শত্রুপক্ষের জাহাজের গায়ে তার টর্পেডোটি বসিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে বার দরিয়ায় পালাবে। পালাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণের ফলে জলে আলোড়ন উঠবে আর অবাধ সমুদ্র যাত্রায় বাধাদানকারী একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস হবে। আমাদের কাছে এটা শত্রুপক্ষের বিমানধ্বংসী কামানের সারির মুখে গ্যাস-বেলুন নিয়ে ভেসে যাওয়ার মতই আহাম্মকী মনে হলেও রবার্ট এ কাজে এগোল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর সে তার মাল্লা দুজনকে নিয়ে ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেলে যাত্রা করল। সাবমেরিনের ওপর পাল খাটিয়ে দুলতে দুলতে এই তিনজন চল্‌ল। গোড়ার দিকে আবহাওয়া ভালই ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল মার্কু দ্বীপ থেকে সাত মাইলের কিছু বেশী দূরে একটা জায়গা। মাঝে বার কয়েক ঝড় না হলে ঠিক সময়েই তারা পৌঁছতে পারত। এমনিতেই সেখানে যথেষ্ট ঢেউ আর এখন ত চ্যানেলের চতুর্দিকেই ঢেউয়ের ধাক্কা। তার মধ্যে নটিলাস একটা পিপের মত পড়ে চতুর্দিক থেকে ঘা খেতে লাগল। আকাশ পরিষ্কার হল। দেখা গেল তখনো সাবমেরিনে

একটুও জল ঢোকে নি। সেটা তার যাত্রাপথ ধরে চলতে লাগল। অবশেষে সেটি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছল। ছোট একটা বন্দর—এখানে ইংরেজ জাহাজগুলি নোঙর ফেলেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল।

রবার্ট মাঝ রাতে আক্রমণ করা স্থির করল। শান্ত সমুদ্রের ওপর পাল গুটিয়ে নিয়ে সে স্যাঁতসেঁতে জাহাজের মধ্যে নেমে এল। পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা ভাল্‌ভ্‌ খুলে দিল। তোড়ে জল ঢুকে চৌবাচ্চাগুলো ভর্তি হল, আর নটিলাস ডুবতে শুরু করল। তিন জন লোক জলের তলায় চলল। সকলেই একটা ছোট ঘরে জড়ো হয়েছে। মিটমিটে একটা মোমবাতি স্যাঁতসেঁতে লোহার দেওয়ালে বিচিত্র ছায়া ফেলছে। সেই মুহূর্তেই নাবিকেরা ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে শুরু করল আর রবার্ট কম্পাস আর ব্যারোমিটারের সাহায্যে তাদের পথনির্দেশ করতে লাগল। নটিলাস সামনে এগিয়ে চল্‌ল।

"আরো জোরে," দীর্ঘস্থায়ী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রবার্ট বলে। "বন্দরে পৌঁছবার আগে যদি ভাঁটা শুরু হয় ত আর পারা যাবে না।" নাবিক দুজন দ্বিগুণ জোরে কাজ শুরু করে। তাদের হাত-পায়ের পেশী শক্ত হয়ে গিয়ে টন্‌টন্‌ করতে থাকে। প্রাণপণে বেয়াড়া ক্র্যাঙ্কগুলো তাড়াতাড়ি ঘোরাতে থাকে। কয়েক মিনিট নটিলাস বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। কিন্তু তারপর দুজন মাল্লার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার গতিবেগ কমতে থাকে। তারপর জাহাজ একদম নিশ্চল হয়ে গেল।

"বড্ড দেরি হয়ে গেল", হতাশ ভাবে যুল্‌টন বলে উঠল। "ভাঁটা এসে গিয়েছে।" মাল্লা দুজন ক্র্যাঙ্কের পাশে হাত পা এলিয়ে বসে

হাঁপাতে থাকে। জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল বার করে দিয়ে রবার্ট জাহাজের মাথার ওপরকার প্রপেলার ঘোরালো। নটিলাস উঠতে উঠতে জলের ঠিক তলায় এসে থামল। কামরার মধ্যে হাওয়া চলাচলের নলগুলি ওপরে ঠেলে দেওয়া হল, আর অক্সিজেন বাঁচাবার জন্যে বাতিটি নিবিয়ে দেওয়া হল। শেষে নোঙর ফেলা হল।

ফুল্‌টন বলল, "লক্ষ্যের এত কাছে এসে পড়েছি যে ভেসে উঠলেই ওরা আমাদের দেখে ফেলবে। জোয়ার না আসা পর্যন্ত আমাদের ডুবে থাকতেই হবে।"

চার ফুট মাত্র উঁচু স্যাঁতসেঁতে কামরাটায় কোন শব্দ নেই। পাগুলো যতদূর পারে ছড়িয়ে দিয়ে ওরা কজন জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘণ্টা ছয়েক দেরি হবে। কথাবার্তা বিশেষ কেউ বলেনি। হাতে কোন কাজ না থাকায় নাবিক দুজনের মনে জলে ডুবে বা বিস্ফোরণের ফলে মৃত্যুর আশঙ্কা জাগল। যদি ভোর বেলা ইংরেজরা ওদের হাওয়া ঢোকার নল দেখতে পায়! এই রকম পাগলের মত সমুদ্রযাত্রা তাদের করাই উচিত হয় নি। এখন আর উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত তাদের দেখতে হবে।

তবে রবার্টের অবশ্য একমাত্র চিন্তা হল তার সামনে যে কর্তব্যটুকু রয়েছে সেইটুকু। সাফল্য ছাড়া তার মনে অন্য কোন সম্ভাবনার ছায়াও পড়েনি। জোয়ারের সঙ্গে দিনের আলো দেখা দেবে, তবে তারা যদি জলের তলায় ডুবে থাকে ত তাদের দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই সামান্য।

অন্তহীন ছটি ঘণ্টা কেটে গেল। নটিলাস যখন নোঙরের শেকলের

ওপর ঘুরে গেল রবার্ট তখন বুঝল জোয়ার এসেছে। তাড়াতাড়ি হাওয়া ঢোকার নলগুলো নামিয়ে নোঙর তুলে চৌবাচ্চায় জল ভরে ফেলা হল। জাহাজ ডুবতে শুরু করতেই মাল্লারা হাতল ধরল,



রবার্টের পরিচালনায় মাল্লারা হাতল ঘোরাতে থাকে

রবার্টও তার যন্ত্রপাতি নিয়ে পড়ল। অবশেষে নটিলাস বন্দরে ঢুকে তার লক্ষ্যের দিকে এগোল। টর্পেডোগুলো তৈরি রাখা হল। চরম মুহূর্ত উপস্থিত!

কিন্তু তাই কি? কয়েক মুহূর্ত পরেই ফুল্‌টন তার দুর্ভাগ্যের তিক্ততা অনুভব করলো। জোয়ার আর ভাঁটার মধ্যবর্তী সময়ে ইংরেজ জাহাজ দুটি পাল তুলে সরে পড়েছে। একথা প্রথমে তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, কিন্তু যখন সাবধানে নটিলাস জলের ওপর উঠল আর বন্দরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তার নজরে পড়ল

তখন আর সন্দেহ রইল না যে ওদুটো সরে পড়েছে। করুণ ভাবে "ফুল্‌টনের বরাত !" বলে ক্লান্ত দেহে সে কামরার মধ্যে নেমে এল। তখন নটিলাস আবার ঘুরে তার দীর্ঘ যাত্রা শুরু করলো ফ্রান্সের দিকে। ফেরার পথে আর কোন বিপদ ঘটেনি।

সেই হেমন্তে সে ওই দুটি জাহাজের উদ্দেশেই আবার অভিযান করল। কিন্তু আবার তারা ওর হাত ফস্কে গেল। সে বুঝতে পারল যে ইংরেজদের সতর্ক গোয়েন্দা বিভাগ তার পরিকল্পনার খবর পেয়ে গিয়েছে আর তাদের যুদ্ধজাহাজের অধ্যক্ষদের সাবধান করে দিয়েছে। এদিকে শীত পড়ে আসছে। শীতকালের মত নটিলাসকে তুলে রাখা হল। ইতিমধ্যে ফরাসী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টায় সে ঢিল দেয়নি। সরকার অবশেষে তাকে আরো পরীক্ষা চালাবার জন্যে ১০,০০০ ফ্রাঁ মঞ্জুর করলেন। আর কোন জাহাজ ডোবাতে পারলে মোটা টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করা হল। এতে একটু উৎসাহ হল, কারণ ইতিমধ্যে রবার্ট নিজের টাকা থেকে এর তিনগুণেরও বেশী টাকা খরচ করে ফেলেছে।

পরের বছর সে জলের তলায় আট ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারে এই রকম একটা আরো বড় সাবমেরিন আর আরো ভালভাবে টর্পেডো ছাড়ার ব্যবস্থার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করলো। এইসবের দরুন তার আরো অর্থব্যয় হচ্ছিল, ইতিমধ্যে ফরাসী সরকার তাকে আরো বেশী অর্থ মঞ্জুর করার পরিবর্তে চুপ করে বসে দেখছিলেন যে আরো কতদূর সে এগোয়। এ ধরনের ঔদাসীন্যের মুখে তার পক্ষে চিরকাল একাধারে আবিষ্কারক, অর্থের যোগানদার আর জলের তলায় জাহাজ চালাবার নাবিকের কাজ করে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যদিও হাল

ছেড়ে দেওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ, তবু এই রকম বাধার মুখে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হল। হয়ত সে "স্বপ্নদ্রষ্টা" মাত্র। হয়ত বা তার ডুবোজাহাজ শেষ অবধি একটা "পাগলামি প্রচেষ্টা" মাত্র।

পৃথিবীতে কেউ কেউ তরুণ বয়সেই সাফল্যলাভ করে। অন্যেরা তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে বৃদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য অনেকে, হয়ত অধিকাংশই আদৌ সাফল্য অর্জন করতে পারে না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রবার্টের বয়স হল ছত্রিশ। বৃদ্ধ সে হয়নি, কিন্তু যৌবন তার অবশ্যই পেছনে পড়ে। চিত্রশিল্পী হিসেবে সে বিফল হয়েছে, আর আবিষ্কর্তা হিসেবে ঠিক সত্যিকারের সাফল্য অর্জন করতে সে পারেনি। কিন্তু কখনো কখনো পরাজয় পরাজিতকে আরো বেশী পরিশ্রম করতে উত্তেজিত করে!

রবার্ট ফুল্টনের বেলাও হল তাই। তার স্বভাব ঠিক সাধারণের মত নয়। প্রতিটি পরাজয়ের ফলে তার কর্মক্ষমতা আর শক্তি বেড়েই যেতে থাকে। এখন সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজের সামনে এসে উপস্থিত।

৬

তার প্রথম বাষ্পীয় পোত

তখনো তার ডুবোজাহাজটির গুরুত্ব প্রমাণ করবার সংগ্রামে রবার্ট গভীর ভাবে মগ্ন, এমন সময় চ্যান্সেলার রবার্ট আর. লিভিংস্টন নামে এক বিত্তশালী আমেরিকান প্যারিসে উপস্থিত হলেন। লিভিংস্টনের হাডসন রিভার অঞ্চলে জমিদারী ছিল আর নিউ ইয়র্ক স্টেটের তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট রূপে তিনি জর্জ ওয়াশিংটনকে শপথ গ্রহণ করান। এখন রাজনীতিবিদ্ হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নে ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের পদ নিয়ে এলেন।

লিভিংস্টনও নিজেকে একজন আবিষ্কর্তা বলে মনে করতেন যদিও যন্ত্রবিদ্যায় জ্ঞান তাঁর সামান্যই ছিল। আমাদের কাহিনীতে এঁর গুরুত্ব কেবল এই যে বাষ্পশক্তির সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল। ইতিপূর্বে দেখেছি যে রবার্টের মত আবিষ্কর্তাদের এমন লোকের সাহায্য দরকার, যাঁদের অর্থ আছে আর সেই অর্থ যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যয় করতে প্রস্তুত। বাষ্পচালিত জাহাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে লিভিংস্টন দীর্ঘকাল কৌতূহলী ছিলেন। ১৮০১-এর নভেম্বরে প্যারিসে উপস্থিত হয়েই তিনি রবার্ট ফুল্টন নামে এক

বুদ্ধিমান আমেরিকান যুবক সম্বন্ধে অনেক কথা শোনেন। অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটল।

আমরা বেশ কল্পনা করতে পারি যে রবার্ট সঙ্গে সঙ্গেই ডুবো-জাহাজের কথা পেড়ে একধার থেকে বলতে শুরু করে, যতক্ষণ না চ্যান্সেলার লিভিংস্টন (লোকটি অধৈর্য ছিলেন) তাকে জোর করে থামিয়ে দেন। "মিঃ ফুল্‌টন, সাবমেরিন সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য নেই। বাষ্পশক্তিকে জাহাজ চালাবার কাজে লাগাতেই আমি উৎসুক। সে বিষয়ে কখনো ভেবে দেখেছেন কি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ভেবেছি বৈ কি !" রবার্টের স্বাভাবিক আগ্রহের সঙ্গে কথা বলাটাও যেন আমরা শুনতে পাই। "কয়েক বছর আগে ইংল্যাণ্ডে আমি একটা নৌকো তৈরি করি ; সেটা চালানোর ব্যবস্থা ছিল কতকটা মাছের মতন। আমার মতলব ছিল স্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে পেছনের একটা দাঁড় মাছের ল্যাজের মত নাড়িয়ে নৌকোটা চালানো।"

"সেটা কি রকম হল শেষকালে" ? লিভিংস্টন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই নক্‌শাটা নিখুঁত করতে গিয়ে অনেক রকম সমস্যা দেখা গেল। তাই আরেকটা মতলব ঠিক করলাম। একটা মডেল তৈরি করে তার সামনের দিকে প্যাড্‌ল্‌ হুইল (দাঁড় বসান চাকা) লাগিয়ে দিলাম, মডেল নৌকোটা ছিল সরু লম্বা, তলাটা ছিল চ্যাপ্টা, যাতে জলের ওপর বেশী জায়গা না নেয়। ইংল্যাণ্ডের বুলটন অ্যাণ্ড ওয়াটকে চিঠি দিলাম যদি নৌকোতে বসানোর মত তিন কি চার হর্সপাওয়ারের একটা ইঞ্জিন তৈরি করে দিতে পারে। কিন্তু তাদের

কোন উৎসাহ দেখা গেল না। অন্য বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় নৌকোর ব্যাপারটা তুলে রাখা হল।"

"বুঝলাম", লিভিংস্টন বললেন, "কিন্তু প্যাড্‌ল্ হুইলের মডেলটা কিরকম চলেছিল ?"

রবার্ট বললো, "স্টীমের জাহাজ চালাবার পক্ষে প্যাড্‌ল্ হুইলই সবচেয়ে ভাল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তিনটে বা ছ'টা প্যাড্‌ল্-ওয়ালা চাকাই সবচেয়ে ভাল বলে দেখেছি। এ না হলে প্যাড্‌ল্-গুলোর একটা অন্যটাকে আটকে দেয়।"

শেষে চ্যান্সেলার লিভিংস্টন বললেন, "অনেকেই সফল একটি বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ চলতে পারে এরকম জাহাজও তৈরি করেছে। কিন্তু কোন না কোন কারণে সকলকেই বিফল হতে হয়েছে। হাওয়া বা জোয়ার-ভাঁটার ওপর নির্ভর না করে চলতে পারে এমন একটি জাহাজের জন্যে সারা দুনিয়া অপেক্ষা করে আছে। এ যে বার করতে পারবে সে বড়লোক হয়ে যাবে। এও বলছি যে সে বিখ্যাত হয়ে উঠবে। মিঃ ফুল্‌টন, আমার বিশ্বাস যে আপনি একটি কার্যোপযোগী বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি করতে পারবেন। একবার চেষ্টা করে দেখবেন ?"

"এটা করা যায় তা জানি," রবার্ট বললো। "কেবল ধৈর্যের দরকার। অন্যেরা কেন বিফল হয়েছে সেটা জানা চাই, যাতে তাদের ভুলভ্রান্তিগুলো এড়ানো যায়। এ নিশ্চয়ই করা সম্ভব। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করে দেখতে রাজী।"

"খুব ভাল কথা।" উৎসাহের সঙ্গে চ্যান্সেলার বললেন। তিনি

রবার্টের করমর্দন করলেন। "আমি আপনার পেছনে আছি, আর যে ভাবে পারি আপনার সাহায্য করব।"

১৮০১-এর অক্টোবরে রবার্ট ফুল্টন আর চ্যান্সেলার লিভিংস্টন একটি অঙ্গীকার-পত্রে সই করলেন। এতে লেখা থাকল যে রবার্টকে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি বাষ্পীয় পোত নির্মাণের জন্যে লিভিংস্টন অগ্রিম টাকা দেবেন। এটি যদি সফল হয় ত রবার্টকে হাডসন নদীর ওপর নিউ ইয়র্ক আর আলবানির মধ্যে চলাচল করবার মত আর একটি জাহাজ তৈরি করতে হবে।

যে উৎসাহে শিকারী কুকুর খরগোসের পিছু ধাওয়া করে সেই ভাবেই রবার্টও এমন একটা উপায় খুঁজতে লেগে গেল, যাতে একটা নৌকো সাফল্যের সঙ্গে চালাবার মত করে প্যাড্‌ল্ হুইল, গীয়ার, ইঞ্জিন আর বয়লার সাজানো যায়। আগেকার আবিষ্কর্তাদের তৈরি স্টীমবোট কেন নিষ্ফল হল? আর যদি এদের ধারণাগুলি ঠিক হয়ে থাকে ত সেগুলো ঠিক কেন? তারা যদি ভুল করে থাকে ত তারই বা কারণ কি? রবার্ট লিখল, "এসবই প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত। আসল আবিষ্কার হল সেগুলি খুঁজে বার করা। শিল্পী যতদিন না উচিত মত পরিমাপ জানতে পারছে ততদিন তাকে অন্ধকারে হাতড়াতে হবে। একথা বলা চলবে না যে সে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর আবিষ্কার বা প্রয়োজনীয় কিছু উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে।

নৌকো তৈরি শুরু করার আগে রবার্ট ঘড়ির স্প্রিং-এর জোরে চলে এইরকম নানা ধরনের প্যাড্‌ল একটা ছোট মডেলের সঙ্গে লাগিয়ে দেখলো। তার চার ফুট মডেলটি পুকুরে চালিয়ে দেখার ফলে সে অনেক ক্ষতিকর ভুলভ্রান্তি এড়াতে সক্ষম হয়। জাহাজ

চালনার পক্ষে প্যাড্‌ল্‌ হুইলই যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় এ সম্বন্ধে সে স্থিরনিশ্চয় হল। তারপর সে তার অন্য প্রধান সমস্যাটির সমাধানে মন দিল। সে হ'ল, কি ভাবে ইঞ্জিনের সর্বশক্তিটুকু প্যাড্‌ল্‌ হুইলে নিয়োজিত করা যায়।

অবশেষে সে জাহাজ তৈরির সময় হয়েছে বলে স্থির করল। তার দৈর্ঘ্য হবে ৭০ ফিট, চওড়ায় ৮ ফিট আর উঁচুতে ৩ ফিট। প্যাড্‌ল্‌ হুইলের ব্যাস হবে ১২ ফিট। জাহাজটা তৈরির জন্যে সে সেন এর ধারে পেরিয়ে ব্রাদার্স-এর কারখানাটাই পছন্দ করলো। এখানেই তার সাবমেরিনটি তৈরি হয়েছিল। এখন শুরু হল হাতে করে কাজ করার দীর্ঘ মন্থর দিন—জাহাজের খোলের জন্যে তক্তা চিরে লাগানো আর স্টীম ইঞ্জিন থেকে প্যাড্‌ল্‌ হুইলে শক্তি বহনের যন্ত্রের ছোট বড় অংশগুলি হাতুড়ি পিটে তৈরি করা।

পূর্ববর্তী আবিষ্কর্তাদের কয়েকজনের মত সে তার ইঞ্জিন নিজে তৈরি করা প্রয়োজন বলে মনে করল না। বরং সে পেরিয়ের কারখানা থেকে একটা আট-অশ্বশক্তির ইঞ্জিন ভাড়া নেওয়াই স্থির করলো। তখন সদ্য স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়েছে। প্রধানতঃ সেগুলো ইংল্যাণ্ডের কয়লাখনির ভেতর থেকে জল পাম্প করে বার করবার কাজেই লাগানো হত। এই ধরনের ইঞ্জিন ফ্রান্সে তখন গোটা কয়েক ছিল। এদেরই একটা রবার্ট তার জাহাজে বসানো স্থির করল। অবশ্য এই ইঞ্জিনটি জাহাজ চালাবার মতন করে তৈরি হয়নি, কিন্তু রবার্ট ভাবল এটাকে কাজ চালাবার উপযোগী করে ঠিক করে নেওয়া চলবে।

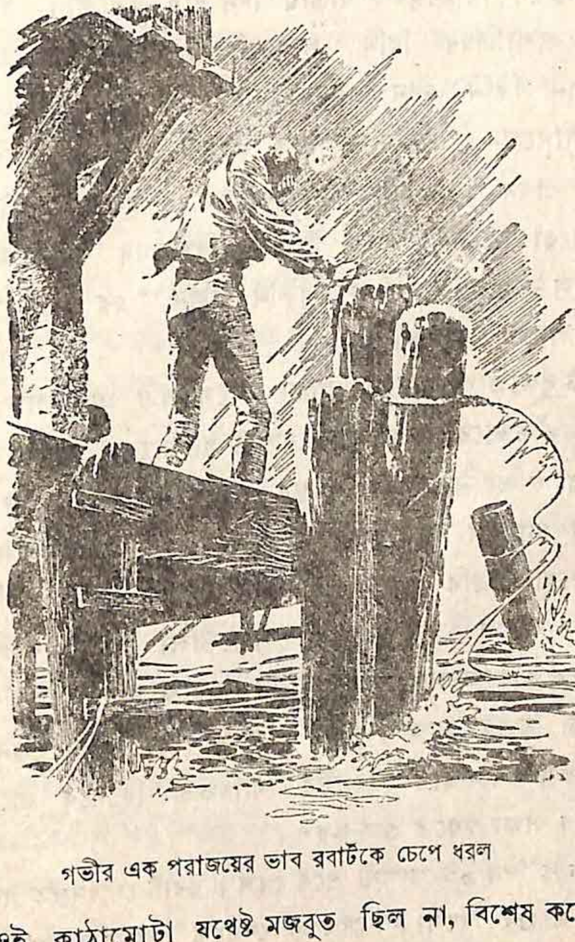
একে একে উত্তেজনাময় দিনগুলি কেটে গেল। শেষে ১৮০৩-এর

বসন্তে রবার্ট ফুল্‌টনের প্রথম স্টীম বোট পেরিয়ে কারখানার নিচে সেনের ধারে সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গেল। পরীক্ষামূলক ভাবে চালানোর কয়েক দিন মাত্র আগে এক গভীর রাত্রে বাইরে ভীষণ ঝড়ের গর্জন আর দরজায় ধাক্কার শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"মিঃ ফুল্‌টন! মিঃ ফুল্‌টন!" রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে এক চীৎকার শোনা গেল। "জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে গিয়েছে।" কোটটা চাপাবারও তর সইল না, রবার্ট সেই ঝড়ের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার চোখে পড়ল এক করুণ দৃশ্য। সেই দিন বিকেলে যেখানে তার জাহাজটি বাঁধা ছিল সেখানে এখন কেবলমাত্র বৃষ্টির ছাটের মধ্যে ঢেউ দেখা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট সে আচ্ছন্নের মত সেই দিকে চেয়ে রইল। বিপুল এক পরাজয়ের ভাব তাকে যেন চেপে ধরেছে। তারপর বিবশ হয়ে সে ভাবতে লাগল জাহাজটা কিভাবে তোলা যেতে পারে।

সে রাত্রে সে আর বাড়ি ফিরল না, তার পরের দিনও না, তার পরের সন্ধ্যাতেও নয়; খাবার জন্যেও সে বিলম্ব করেনি। সর্বাঙ্গ তার ভিজে জবজব করছে। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে অমানুষিক পরিশ্রমের পর শেষে কোনমতে জাহাজটা সে তুললো। তখন সে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ফিরল। দীর্ঘকাল ঠাণ্ডায় থাকা আর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাকে অসুস্থ দেখে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকতে আদেশ দিলেন। কিন্তু রবার্ট ত তা থাকবে না। তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন বুঝে সে অবিলম্বে নদীর ধারে গিয়ে মেরামতের কাজ তদারক করতে লেগে গেল। সারাক্ষণ সে এতই অসুস্থ বোধ করছিল যে দাঁড়িয়ে থাকার মত শক্তিটুকুও যেন তার ছিল না।

নৌকোটা ডুবলো কেন? নিশ্চয়ই তার নক্‌শায় গুরুতর ভুল হয়েছে। বয়লার আর ইঞ্জিনটা এত ভারী ছিল যে সেগুলো বসানোর



গভীর এক পরাজয়ের ভাব রবার্টকে চেপে ধরল

জন্যে ওই কাঠামোটা যথেষ্ট মজবুত ছিল না, বিশেষ করে ঝড়ের সময়। এখন ক্লান্ত দেহে আবার সে সেই ভুল শোধরাতে লেগে গেল।

যত দিন যায় তার শক্তিও ক্রমে ফিরে আসতে থাকে আর সেই সঙ্গে তার প্রফুল্ল আশাবাদ। মেরামত ভালই হল। ১৮০৩এর ৯ই আগস্ট সে পরীক্ষামূলক যাত্রার দিন ধার্য করলো। ইতিমধ্যে সম্রাট নেপোলিয়ন—যিনি সাবমেরিনটি কতকটা উপেক্ষাই করেছিলেন, তিনি এখন এই স্টীমারের প্রতি কিন্তু মনোযোগ দিতে লাগলেন। তিনি রবার্টকে প্রথমে স্বপ্নদ্রষ্টা বলেই মনে করতেন, এখন কিন্তু তাঁর মত বদ্‌লাল। ফুল্‌টনের স্টীমারের কথা আরো আগেই তাঁকে তাঁর নৌবিভাগের মন্ত্রীর জানানো উচিত ছিল বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, "এর দরুন পৃথিবীর চেহারাই পাল্টে যেতে পারে।"

সম্রাট বুঝতে পারেন যে আরো আগে যদি এই বাষ্পচালিত জাহাজ নিখুঁতভাবে তৈরি করা যেত ত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি পুরোদস্তুর অভিযান চালান সম্ভব হত। ফরাসী সৈন্যে ভর্তি গাধাবোট চ্যানেল পার করে টেনে নিয়ে যাওয়ার মত অনেকগুলি বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি করা যেত। বাতাস নেই এমন একটি দিন নির্ধারিত করলে ইংরেজদের পালতোলা জাহাজগুলি এই বাষ্পচালিত জাহাজ আর গাধাবোটের বহরকে বাধা দিতে পারত না। এটা যতই আকাশ-কুসুম বলে মনে হোক না কেন, এই প্রথম কিন্তু সাধারণে রবার্টের আবিষ্কর্তা হিসেবে প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতে শুরু করল।

পরীক্ষার দিন ৯ই আগস্ট এসে গেল। রবার্ট সোৎসাহে বয়লারে কাঠের আগুন দিলো। দেখতে দেখতে সেটায় বাষ্পের গুঞ্জন শুনতে পাওয়া গেল। দুপুর বেলাটা সে সযত্নে যন্ত্রপাতিগুলি

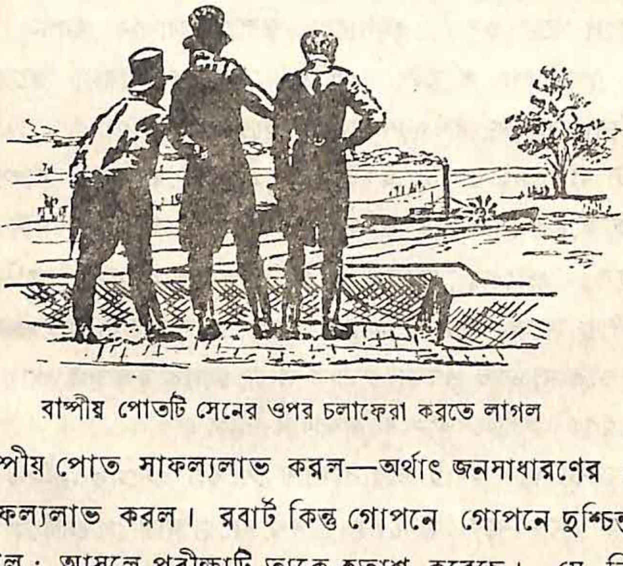
ঠিকঠাক করে রাখল, আর যে তিনজন তার মাল্লা হিসেবে কাজ করবে তাদের সযত্নে উপদেশ দিল। বিকেল যত গড়িয়ে আসে, নদীর ধারে ততই লোক জমায়েত হতে শুরু হয়। পরীক্ষার ধার্য সময় ছ'টার একটু আগেই ফরাসী নৌবহর আর সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হলেন। ছ'টার কয়েক মিনিট আগে রবার্ট একবার শেষবারের মত ইঞ্জিনটি পরীক্ষা করে দেখে নিল। সবই ঠিক আছে বলে মনে হল। বয়লারের তলায় আগুন গন্‌গন্‌ করছে, বাষ্পের চাপ বেশ ভালই। ধোঁয়া বেরুবার জায়গা দিয়ে লম্বা হয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে. দর্শকবৃন্দ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

ছ'টা বাজতেই রবার্ট একটা ভাল্‌ভ ঘুরিয়ে দিল। বাষ্পস্রোত গিয়ে ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার ভর্তি করল। মৃদু গর্জনে পিস্টনটা ঘুরতে শুরু করল। পাশের বিরাট চাকা দুটো ঘুরতে লাগল, একটির পর একটি দাঁড় জলে আঘাত করে। বাষ্পীয় পোতটির চলা শুরু হল। বেগ বাড়তে বাড়তে এর গতি দ্রুত পায়ে চলার মত হল আর সঙ্গে সঙ্গে তীরবর্তী দর্শকদের মধ্যে জয়ধ্বনি উঠল।

দেড়ঘণ্টা কাল রবার্ট তার বাষ্পীয় পোতটি সেনের এদিক থেকে ওদিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ালো। দশ বারো বার সে সেটিকে ঘুরিয়ে থামিয়ে আবার চালিয়ে দেখাল যে যন্ত্রটি সে ইচ্ছামত পরিচালন করতে পারে। আরো দুটো নৌকো বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে সে তার জাহাজের শক্তির প্রমাণ দিল।

পরীক্ষার শেষে সরকারী কর্তৃপক্ষ ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে রবার্টকে অভিনন্দনে আচ্ছন্ন করে দিলেন। অবশেষে সে তার জীবনের পরম মুহূর্তের নায়ক হ'ল, এমনকি যারা তার এই পরীক্ষা

চোখে দেখেনি তাদের কাছেও। একটি ফরাসী সংবাদপত্রে এর বর্ণনা বেরুলো, "একটা নৌকো······ছুটি বিরাট চাকা রথের মতো অক্ষদণ্ডের উপর লাগানো, তার পেছনে নল লাগানো একটি বিরাট চুল্লী কতকটা ছোট দমকলের ইঞ্জিনের মত, তাই দিয়ে চাকাগুলি ঘোরান হয়।" দেড় ঘণ্টা ধরে রবা ফুল্‌টন, "রথের মত চাকা দিয়ে নৌকো চালানোর বিচিত্র দৃশ্য দেখান।"



বাষ্পীয় পোতটি সেনের ওপর চলাফেরা করতে লাগল

বাষ্পীয় পোত সাফল্যলাভ করল—অর্থাৎ জনসাধারণের চোখে এটি সাফল্যলাভ করল। রবার্ট কিন্তু গোপনে গোপনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রইল; আসলে পরীক্ষাটি তাকে হতাশ করেছে। সে নিশ্চিত ছিল যে জাহাজটি ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে যাবে, কিন্তু এটা গিয়েছে আসলে তিন কি চার মাইল বেগে। যথেষ্ট তাড়াতাড়ি নয়—আবার তাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

৭

আর যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন

বাষ্পশক্তির সবচেয়ে সরল উদাহরণ হ'ল চায়ের কেটলি। কেটলির জল ফুটতে শুরু হবার পরেও যদি বার্নারটা নিবিয়ে দিতে



ভুল হয় তখন হয়ত লক্ষ্য করে দেখেছ যে কেটলির ঢাকনাটা একটু একটু লাফাচ্ছে আর নল দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে আসছে। নলের মুখটা মুহূর্তের জন্যে বন্ধ করে দিলে, যে ফুটন্ত জল বাষ্পে পরিণত হচ্ছে তার আর বেরুবার রাস্তা থাকে না। সেটা তখন কেটলির ভেতর দিকে চাপ দিতে থাকে। ঢাকনির তলায়ও চাপ ক্রমে বাড়তে

থাকে। তারপরেই সেটা ধপাধপ উঠতে আর পড়তে থাকে আর তার ফাঁক দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে আসতে থাকে।

২১২ ডিগ্রি ফারেনহাইটে জল ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়। এই সাধারণ তথ্যের ওপর বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের নীতি প্রতিষ্ঠিত। বাষ্পকে যদি বেরুতে না দিয়ে একটা পাত্র বা বয়লারের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয় ত তার চাপ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। এই বাষ্পকে যদি একটু একটু করে বয়লার থেকে বার করা হয় ত তার মুখে যাই পড়ুক না কেন সেটাকে ঠেলতে থাকবে। ইঞ্জিনের এই বহির্মুখী বাষ্প একটা পিস্টনকে ধাক্কা দেয়। একটা সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টনটা যাওয়া-আসা করে। তার সঙ্গে লাগানো থাকে একটা ক্র্যাঙ্ক। সেটা আবার একটা চাকাকে ঘোরায়। সবচেয়ে সরল স্টীম ইঞ্জিনের এই হল পদ্ধতি।

তবু কেবল বাষ্পের এই কর্মক্ষমতার আবিষ্কার নয় সেটাকে ইঞ্জিন চালাবার কাজে লাগাতে মানুষের কত যুগই না কেটে গিয়েছে। সাফল্যের সঙ্গে একটা বাষ্পীয় পোত তৈরি করতে রবার্ট ফুলটনকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেটা তখনই বুঝবে যখন জানবে যে স্টীম ইঞ্জিন তৈরি করতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গিয়েছে, তবেই সেটা জাহাজ চালানোর কাজে লেগেছে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে কনিষ্ঠ হীরো নামে একজন গ্রীক বাষ্পের ক্ষমতা প্রদর্শন করেন আর একটি মন্দিরের দরজা খোলা এবং বন্ধ করার কাজে এটি লাগান। তার দু হাজার বছর কেটে যাবার পর আবিষ্কর্তারা সত্যিকারে কাজ হয় এমন একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করতে পারলেন। ১১০০ শতকে ইউরোপে একটি

অর্গ্যান বাজানোর জন্যে বাষ্পের ব্যবহার হয়। তিনশ বছর পরে লোকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কথা চিন্তা করতে শুরু করে এমন কি তার নকশাও আঁকা হয়। কিন্তু তার বেশী তারা কিছু করতে পারেনি।

কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের একশ আটত্রিশ বছর পরে মার্কুইস্ অব উরস্টার নামে একজন ইংরেজ একটি স্টীম ইঞ্জিন তৈরি করেন। তারপর এলেন আরো কয়েকজন ইংরেজ—টমাস্ স্যাভেরী, টমাস্ নিউকামন এবং অবশেষে জেম্‌স্ ওয়াট্। এঁরা প্রত্যেকে অন্যের ইঞ্জিনগুলির উন্নতিসাধন করেন। রবার্ট ফুল্‌টন যখন ফ্রান্সে তার প্রথম বাষ্পীয় পোত তৈরি করে ততদিনে প্যাড্‌ল্ হুইল চালাবার মত শক্তিশালী স্টীম ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে।

স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কার এক কথা আর সমুদ্রগামী জাহাজে তাকে বসান হল আরেক কথা। ১৭০৭ সালে ডেনিন্ প্যাপিন নামে এক ফরাসী এই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কতকগুলি মূর্খ মাঝি প্যাপিনের নৌকো ডাইনীর কাণ্ড মনে করে সেটি ধ্বংস করে এবং তার আবিষ্কর্তাকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। পরে জোনাথান হাল্‌স্ নামে এক ইংরেজ ঘড়িওয়ালা একটি নকশা প্রস্তুত করে বাষ্পীয় পোত নির্মাণের চেষ্টা করেন, কিন্তু লোকের বিদ্রূপের চোটেই তাঁকে পালাতে হয়। পাড়ার লোকে ছড়া কাটলে :

বিদ্‌ঘুটে বুদ্ধির জেনাথান হাল
বানালে নৌকো এক না লাগিয়ে পাল
কিন্তু ছিল সে এক গাধা
তাই রক্ষা হল না শেষ দাদা
শেষে উধাও হল সে হয়ে নাকাল।

বিদ্রোহের কয়েক বছর আগে কাউন্ট যোসেফ দ্য অক্সিরো নামে একজন ফরাসী একটি বাষ্পীয় পোত তৈরি করেন। কিন্তু সেটিও আশে-পাশের মাঝিরা ডুবিয়ে দেয়। পালের জাহাজ ছাড়া অন্য কিছুই তারা বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না।

এ বেচারীর পরে এলেন মার্কুইস দ্য জুফ্রয় নামে এক তরুণ ফরাসী অভিজাত। তিনি প্যাড্‌ল হুইল লাগানো ১৩০ ফুট লম্বা এক স্টীমার তৈরি করেন। সেটি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চালানো হয়। জাহাজটা পনেরো মিনিট ধরে চলার পর বন্ধ হয়ে গেল। তাহলেও তিনিই বোধ হয় প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বয়ংক্রিয় শক্তির সাহায্যে জাহাজ চালান। প্যারিসে আর একটা পরীক্ষা করে না দেখানো পর্যন্ত ফরাসী সরকার তাঁকে পেটেণ্ট দিতে নারাজ হলেন। নিরুৎসাহ হয়ে জুফ্রয় হাল ছেড়ে দেন।

তারপর হলেন ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম সিমিংটন যিনি ১৮০১ সালে "শার্লোট ডাণ্ডাস্" নামে একটি স্টীমার তৈরি করেন। এই নৌকোটি ঘণ্টায় পাঁচ থেকে সাত মাইল পর্যন্ত বেগে চলতে পারত আর খাল দিয়ে গাধাবোট টানার কাজে এটিকে লাগানো হয়েছিল। তারপর সিমিংটনকে যিনি অর্থ সাহায্য করতেন তিনি মারা গেলেন, আর ইনিও আরো পরীক্ষার কাজ বন্ধ করলেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকায় কি হচ্ছিল? মনে আছে বোধ হয় যে রবার্টের বয়স যখন মাত্র ছ'বছর তখন তাদের বাড়ি ল্যাঙ্কাস্টার শহরে উইলিয়াম হেন্‌রী সেই ১৭৭১ সালেই বাষ্পীয় পোত নির্মাণের চেষ্টা করেন। ১৭৮০ নাগাদ জেম্‌স্ রাম্‌জে তিনটি বিভিন্ন বাষ্পীয় পোত

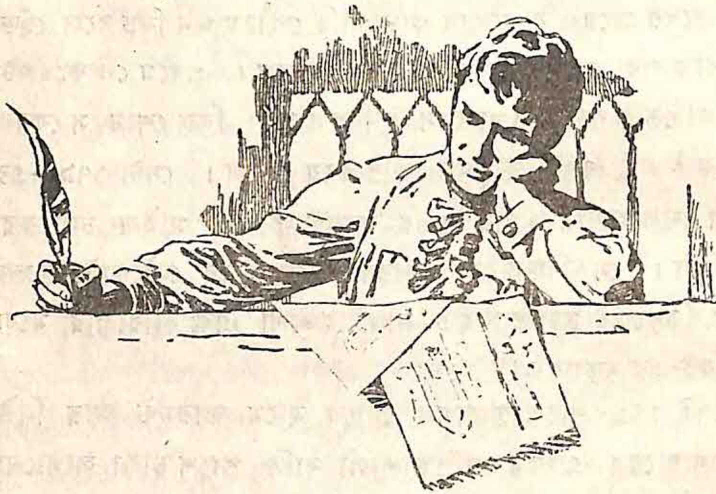
তৈরি করেন; দুটি আমেরিকায় আর একটি ইংল্যাণ্ডে। বেচারী রাম্‌জে সাফল্যের মুখে এসে মারা যান।

এদের চেয়েও সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছয় জন ফিচ বলে ছেঁড়া পোশাক পরা রুগ্ন চেহারার এক চাষার ছেলে। প্রথমে সে কয়েকটা নৌকো তৈরি করে, সেগুলো সবই বিফল হয়। কিন্তু শেষে সে কেবল নৌকোই নয়, একটা ইঞ্জিনও তৈরি করে ফেলে। সেটা ১৭৯০-এর গ্রীষ্মে ডিলাওয়্যার নদীর ওপর কয়েক হাজার মাইল চলাফেরা করেছিল। সে বিফল হল, কারণ লোকে তার নৌকোটাকে ভয় করত, কিছুতেই চড়তে চাইত না। হতাশা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জন ফিচ-এর মৃত্যু হয়।

সেই ১৭৯০ সালে স্যামুয়েল মোরে নামে ভারমণ্ট আর নিউ হ্যাম্পশায়ারের একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি পাশে চাকা লাগানো ছোট্ট একটি বাষ্পচালিত নৌকোয় কনেকটিকাট্ নদীতে বেড়িয়েছিলেন বলে জানা যায়। আরো লোক ছিলেন, যেমন রোড আইল্যাণ্ডের ইলাইজা অর্মস্‌বী, নিউজার্সির জন স্টীভেন্স আর উইলিয়াম লংস্ট্রীট আর ডিলাওয়্যারের অলিভার ইভান্স। এঁরা সকলেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন না কোন কারণে বিফল হন।

এখনো পর্যন্ত রবার্ট ফুল্‌টনও সাফল্য লাভ করে নি। তার প্রথম বাষ্পীয় পোতটি একটা খেলার জিনিস হয়েছে মাত্র। তার আগের অন্যান্য আবিষ্কর্তাদের নৌকোর গতিবেগ তার চেয়ে বেশী ছিল। এখনো এই ১৮০৩-এর হেমন্তে দুনিয়ার লোক এমন একটি মজবুত এবং দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত আশা করছে যা কয়েক হাজার বছর ধরে পালতোলা জাহাজে ভ্রমণের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে।

এটা যে তৈরি করবে সেই ব্যক্তি কি রবার্ট ? হয়তো তাই। হয়তো তার পূর্ববর্তীদের চেয়ে একটা গুণ তার বেশী ছিল—তার



রবার্ট ছাড়বার পাত্র নয়

ছিল অসাধারণ সাহস। সে ঠিক তাদের মতই পরাজয় আর হতাশার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু ছাড়বার পাত্র সে নয়।

৮

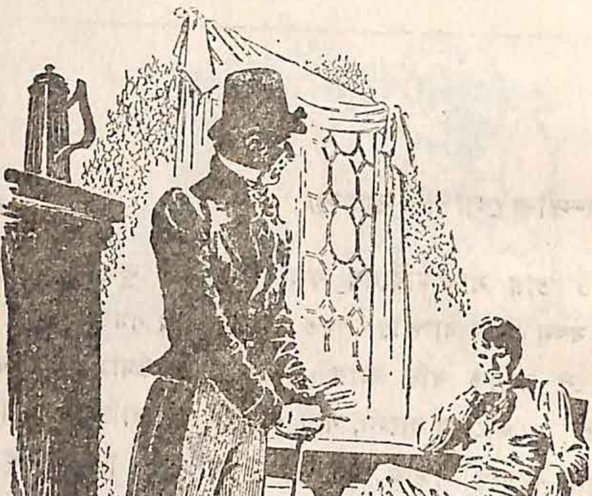
এক বন্দীর গোপন রহস্য

রবার্ট তার সাবমেরিনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারে নি। এমনকি যখন প্রথম বাষ্পীয় পোত নির্মাণে তার সমস্ত চিন্তা নিযুক্ত, তখনো সে ভাবত যদি আর একটা সমুদ্রগর্ভগামী জাহাজ তৈরি করা যেত ! জোয়েল বার্লো, যাঁর প্যারিসের বাড়িতে রবার্ট সাত বছর বাস করেছে, তিনি "টুট্"কে (রবার্টকে তিনি ওই নামে ডাকতেন) বোঝাবার চেষ্টা করেন যে একই সঙ্গে দুটো কাজ করা যায় না।

"টুট্-এর টাকার দরকার," বার্লো এক বন্ধুকে লেখেন। "কাল তাকে আমায় যে ৩০০০ (ফ্রাঁ) দিতেই হবে, আর মাসের শেষে যে আরো ৩০০০ দিতে হবে তাছাড়াও তার আরো তিন হাজার চাই ব্রেস্ট্-এ একটি নতুন জাহাজ (সাবমেরিন) তৈরির জন্যে। এর শেষ যে কোথায় তা দেখতে পাচ্ছি না ; দিনকে দিন সে আরো গভীরে ডুবে যাচ্ছে। যদি সে সফল না হয় ত কি যে তার হবে জানি না।" অন্ততঃ স্টীম বোট তৈরির সময় বার্লো তাকে কোন মতে চেপে চুপে রাখতে সক্ষম হন।

কিন্তু রবার্টের পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল হবার অল্প দিনের মধ্যেই

মিঃ স্মিথ নামে একজন রহস্যময় আগন্তুক তার ঘরে গোপনে কথাবার্তা বলবার জন্যে প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন।



এক রহস্যময় আগন্তুক রবার্টের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করেন

মিঃ স্মিথ গোপনতার ভান করে তাকে বললেন, "মিঃ ফুল্‌টন্‌, ইংরেজরা আপনার সাবমেরিনটি ফরাসী নৌ-বহরের বিরুদ্ধে ব্যবহার

করতে চায়।" খবরটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। রবার্টের ভাবনাচিন্তা-গুলো গুছিয়ে নিতে কয়েক মিনিট সময় লাগল।

অবশেষে সে বললে, "কেন যে চাইছে তা ত বুঝলাম না। একদিন আমার সাবমেরিন ব্রিটিশ নৌবহরকেও ধ্বংস করবে। নিশ্চয়ই করবে।"

"তা হতে পারে" স্মিথ বললেন, "কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজরা ওটা চায়। রবার্টের মুখে গভীর চিন্তার রেখা দেখা দিল। ইংল্যাণ্ডে সে অনেক বছর কাটিয়েছে, আর সেখানে তার বন্ধু-বান্ধবও যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভক্ত সে মোটেই ছিল না। তার শক্তিশালী নৌ-বহরের সমুদ্রের ওপর অবাধ অধিকার সে আরো অপছন্দ করত। নেপোলিয়ন যদিও তার সাবমেরিনটি উপেক্ষাই করেছেন, তবু সেই কারণেই কি ফ্রান্সের শত্রুর সঙ্গে ব্যবসা করা উচিত! বোধ হয় না।

তবু শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির মত বিরাট কোন আবিষ্কারও আসলে কোন দেশের সম্পত্তি হতে পারে না। 'এ জিনিস সারা পৃথিবীর সম্পত্তি। হয়ত সাবমেরিনের ব্যবহার প্রচলন করার সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল ইংরেজদের এটা ব্যবহার করতে দেওয়া। তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবীর নৌবহরগুলোকে হয় যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, নয় ত পরস্পরের সাবমেরিনের চোটে ডুবে মরতে হবে।

যুক্তিটা আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে। আনুগত্যের অভাব বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে, যেহেতু সে আমেরিকান সেই জন্যেই তার পক্ষে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের প্রতি সত্যিকারের কোন আনুগত্যবোধ সম্ভব ছিল না। দুটি বিদেশের মধ্যে কোন্‌টি তার সাবমেরিন ব্যবহার করল তা নিয়েও তার কোন

মাথাব্যথা ছিল না। সে একান্তভাবে বিশ্বাস করত যে যত শীগ্‌গির এটার ব্যবহার হয় তত তাড়াতাড়িই সমুদ্রপথে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে। একটা বিষয় সম্বন্ধে সে নিশ্চিত ছিল। এবার থেকে নিজের পকেটের প্রতিটি পয়সা সে যখন এদের প্রয়োজনীয় কোন জিনিস আবিষ্কারের জন্যে খরচ করে কোন ধনী জাতির সরকারী আমলাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবে, তখন আর তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।

অবশেষে সে বললে, "মিঃ স্মিথ, আমি এখন ফ্রান্সে স্টীমবোটটা নিয়ে ব্যস্ত আছি। যদি আমায় ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সাবমেরিন তৈরি করে তার মূল্য প্রমাণ করতে হয় তবে আমার ১০,০০০ পাউণ্ড চাই। এটি তৈরি করে যখন এর মূল্য প্রমাণিত হবে তখন সরকারকে এটি ১০০,০০০ পাউণ্ডে বিক্রি করতে পারি। এই রকম একটি ব্রিটিশ জাহাজের এই দাম। আর আমার একটি লিখিত অঙ্গীকারপত্র চাই।"

স্মিথ বললেন, "এই সময় ফ্রান্সে এই ধরনের লিখিত অঙ্গীকার-পত্র নিয়ে আসা অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

রবার্ট বলল, "তা বটে, বেশ কথা, আমি হল্যাণ্ড যাব। সেখানে আপনি আমায় লিখিত জবাব এনে দেবেন।" এটা স্মিথের কাছে সন্তোষজনক মনে হল। তিনি বিদায় নিলেন। তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময় এলে রবার্ট হল্যাণ্ডে গেল। এক—দুই—তিন হপ্তা, একটা গোটা মাস কেটে গেল, স্মিথের কোন জবাব এল না। তিন মাস ধরে শুধু শুধু অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে রবার্ট ফ্রান্সে ফিরে এল।

অবশেষে একদিন তার দরজায় আস্তে একটি টোকা পড়ল। আবার স্মিথের আবির্ভাব, সঙ্গে গোপন সাঙ্কেতিক লিপিতে ইংরেজের উত্তর। তাতে লেখা যে ইংরেজ সরকার রবার্টের অর্থের দাবিতে রাজী নন, কিন্তু সে যদি শুধু একবার ইংল্যাণ্ডে যায় ত সরকারের কাছে সর্বপ্রকারে সদ্ব্যবহার পাবে।

১৮০৪-এর বসন্তে গভীর দুঃখের সঙ্গে রবার্ট প্যারিস ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করলো। তার সাবমেরিনের দরুন আদৌ কিছু সে ইংরেজের কাছ থেকে পাবে কি না সে সম্বন্ধেও তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফরাসী সরকারের কাছে পূর্বে যেরকম ব্যবহার পেয়েছে তাতে মনে হয় তার লণ্ডন যাত্রায় হয়ত কোনই ফল হবে না। কিন্তু তার মন বললে যেতে তাকে হবেই। সে জানত যে যদি না যায় ত কেবলমাত্র সাবমেরিন নয়—স্টীম বোটটাও তার যাবে।

মনে আছে নিশ্চয় যে বাষ্পীয় পোত নির্মাণের সময় চ্যান্সেলার লিভিংস্টনের সঙ্গে সে একটা অঙ্গীকার করেছিল। এতে শর্ত ছিল যে, প্যারিসের বাষ্পীয় জাহাজটি সফল হলে রবার্টকে আমেরিকায় হাডসন নদীর জন্যে আর একটি জাহাজ তৈরি করতে হবে। জিনিসটা সফল হয়েছে, যদিও রবার্ট এর গতিবেগ সম্বন্ধে হতাশা পোষণ করে। আমেরিকান স্টীম বোটটি তৈরির জন্যে রবার্টের ইংরেজ নির্মাতা বুলটন অ্যাণ্ড ওয়াটের তৈরি একটি স্টীম ইঞ্জিনের দরকার। এরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সে ইতিমধ্যেই এই ইঞ্জিনের অর্ডার দিয়েছিল; কিন্তু বুলটন অ্যাণ্ড ওয়াট তাকে লেখে যে ইংরেজ সরকার ইঞ্জিনটা তাদের আমেরিকায় পাঠাতে দেবেন না। এর কারণ হ'ল যে ইংরেজ সরকার এখন রবার্টের সঙ্গে সাবমেরিন নিয়ে

দরদস্তুর করতে চলেছেন, তাঁরা জানতেন যে ওকে তাঁদের ইচ্ছেমতই কাজ করতে বাধ্য করতে পারেন। কারণ সে নারাজ হলে ওঁরা তার স্টীম বোটের ইঞ্জিনটিও দেবেন না। রবার্ট এই ধরনের ভীতি-প্রদর্শনের শিকার হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল। তার সাবমেরিন আর বাষ্পীয় পোত নির্মাণ উচ্চপদস্থ ইংরেজদের খেয়ালের ওপর নির্ভর করছিল।

পৌঁছবার পর সে সরকারী কর্মকর্তাদের সাবমেরিন সম্বন্ধে অবিলম্বে কাজে নামাবার চেষ্টা করে। তাকে বলা হল অপেক্ষা করতে, আর অপেক্ষাও সে করল—পাঁচ সপ্তাহ ধরে। শেষকালে সে এতই অশান্ত হয়ে পড়ে যে তার ঘুমও হত না। সরকারকে সে লিখলো যে এই দীর্ঘ কটি সপ্তাহ তার সঙ্গে বন্দীর মত ব্যবহার করা হয়েছে। সে সরল বিশ্বাসে ইংল্যাণ্ডে এসেছিল। তার ধারণা ছিল যে সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। তা তাঁরা রাখবেন কি না তা সে এখনই জানতে চায়।

অবশেষে তাকে বলা হল যে এক সরকারী কমিটি তার সাবমেরিনের প্ল্যানগুলি দেখেছেন কিন্তু তাঁদের এ ব্যাপারে আগ্রহ নেই। আসলে ফরাসীদের ব্যবহারের জন্যে সাবমেরিনটি নিখুঁত করার কাজে বাধা দেবার জন্যেই ইংরেজরা ফুল্‌টনকে ব্রিটেনে আমন্ত্রণ করে। তার টর্পেডোটা এমনিতেই ব্যবহারযোগ্য হতে পারে আর সরকার হয়ত কয়েকটা তৈরি করতে চাইতে পারেন। তবে টর্পেডোটা যতদিন না তাঁরা পরীক্ষা করে দেখছেন ততদিন টাকার জন্যে রবার্টকে অপেক্ষা করতে হবে। রবার্ট ক্ষেপে গেল। কিন্তু দেখলো যে মেজাজ দেখিয়ে কোন কাজ হবে না।

গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমেরিকার এক কৃষকের ছেলে কি করতে পারে? বরং ধৈর্য ধরে যে কটা টাকা তারা দিতে রাজী হয় সেটা নিয়ে নেওয়াই ভাল। নইলে কিছুতেই ওরা তার স্টীম বোটের জন্যে বুল্টন অ্যাণ্ড ওয়াটকে ইঞ্জিনটা আমেরিকায় পাঠাবার অনুমতি দেবে না।

অবশেষে সরকার রবার্টকে খরচা বাবদ ৭০০০ পাউণ্ড আর তার ইংল্যাণ্ডে থাকা কালীন মাসে ২০০ পাউণ্ড করে মাইনে দিতে রাজী হলেন। প্রধান মন্ত্রী যখন টর্পেডো সম্বন্ধে উৎসাহী তখন তাকে গোটা কয়েক তৈরি করে ফরাসী নৌবহরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে দেখাতে হবে।

গভীর দুঃখেই রবার্ট পোর্টস্‌মাথ-এ গেল টর্পেডো তৈরি করতে। সে খুবই হতাশ বোধ করল, এত সে অসুস্থ বোধ করত যে প্রায় কিছুই সে খেতে পারত না। তার দুঃখের কথা চিন্তা করতে করতে রাতের পর রাত নিঃসঙ্গ ঘরে জেগে কাটাত। এখন আর তার সাবমেরিন তৈরির কোন সুযোগই রইল না। আর টর্পেডো— সেটা ত কেবল ইংরেজ নৌবাহিনীরই শক্তিবৃদ্ধি করবে। কিন্তু সে ত তা চায় না। সে বরাবরই ভেবে এসেছে যে সাবমেরিন সমুদ্রে অবাধ বিচরণের সুযোগ এনে দেবে। কিন্তু এখন সে সব চিন্তা তাকে বিসর্জন দিতে হবে। আর সরকার ত তাকে টর্পেডো তৈরির অস্ত্র নির্মাণশালা হিসেবেই ব্যবহার করছেন। এগুলো রাত্রে ভাসমান ভেলায় করে নিয়ে গিয়ে, ইংল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য নেপোলিয়ন যে ফরাসী নৌবহর তৈরি করছেন তার নোঙরের শেকলের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আসা হবে। এতে রবার্ট কোন অংশ গ্রহণ করতে চায়নি।

"কিন্তু যদি আমি এখানে না থাকি," সে ভাবলো, "ওরা তাহলে কখনই আমার স্টীম বোটের ইঞ্জিনটা আমেরিকায় নিয়ে যাবার অনুমতি দেবে না।"

১৮০৫-এর ২১শে অক্টোবর, ইংল্যাণ্ড ফরাসীদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ট্রাফাল্গারের যুদ্ধে জয়লাভ করে। ইংরেজ নৌবহর আবার সমুদ্রের সর্বময় কর্তা হল এবং সরকারও রবার্টের টর্পেডো সম্পর্কে নিরুৎসাহ হলেন। এর আবিষ্কর্তার যা মাইনে জুটল তাতে কোনমতে তার ইংল্যাণ্ডে দুবছরের খরচ কুলিয়ে সামান্য কিছু থাকে। তবে সরকার অবশ্য বুল্টন অ্যাণ্ড ওয়াটকে তার স্টীমারের ইঞ্জিনটি আমেরিকায় পাঠাবার অনুমতি দিলেন।

ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা রবার্টের কাছে বিভীষিকার মত হয়েছিল। সে কথা সে ভুলতেই উৎসুক ছিল।

৯

গৃহ মুখে

১৮০৬-এর হেমন্তে সুন্দর একটি পালতোলা জাহাজে রবার্ট আমেরিকা যাত্রা করলো। কতকাল হ'ল, সেই বিশ বছর আগে এই রকম আরেকটি জাহাজে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রথমবারের মত ইংল্যাণ্ডের তটভূমির দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর কত কিই না ঘটে গিয়েছে। তার মনে পড়ল লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে একটি চিঠি দেবার জন্যে কেমন করে সে বেঞ্জামিন ওয়েস্টের কাছে ছুটে গিয়েছিল—যে চিঠির ফলে তার শিল্পী জীবনের শুরু হবে।

বড় কিছু একটা করবার জন্যে মানুষের কত দিন লাগে? কি সব বিরুদ্ধ শক্তিই না তার সামনে দাঁড়িয়েছিল! আবিষ্কারের জগতে দুর্বল লোকের স্থান নেই। আর কতখানিই না আত্মত্যাগ করতে হয়! বয়স তার এখন বিয়াল্লিশ। আজ পর্যন্ত নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেনি। আর স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থার কথা না বলাই ভাল।

কয়েক সপ্তাহ আগে লণ্ডনের এক অপেরার বক্সে সেই সুন্দরী মেয়েটির কথা মনে পড়ায় রবার্টের হাসি পেল। তাকে তার সেই রহস্যময়ী বান্ধবী মাদমোয়াজেল দ্য মোঁতো বলে চিনতে পেরেছিল।

ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ডের বক্সে লর্ড ক্ল্যারেণ্ডনের পাশে ও বসেছিল। তার নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। —ওর সঙ্গে শেষবার দেখা হয় প্যারিসে, ও রবার্টকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মৃদু হেসে নত হয়ে অভিবাদন জানায়। রবার্ট তখন ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে।

"মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোঁতো, কি আনন্দের কথা, আবার আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হল! আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে আপনি।"

"মঁসিয়" মহিলার একজন ফরাসী সঙ্গী বলে উঠল, "আপনার একটু ভুল হয়েছে, কারণ মাদাম্ হচ্ছেন ভাই-কাউণ্টেস্ অব গোঁতো।" বক্সের অন্য লোকেরা হেসে উঠল।

"এটা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে" রবার্ট বলে উঠল, "আপনি সর্বদাই নাম বদলাচ্ছেন! মানুষের যে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখছি এই ভদ্রলোকেরা রহস্যটা জানেন। ব্যাপারটা যদি হাসির হয়, ত সকলে মিলেই না হয় হাসলাম।"

"ঠাট্টাটা" ভাইকাউন্টেস্ অব গোঁতো বললেন, "বড্ড বেশীদূর টানা হয়েছে। এখন আমরা যখন ইংল্যাণ্ডেই রয়েছি মিঃ ফুল্‌টন, তখন ব্যাপারটা আপনাকে সানন্দেই খুলে বলি। আমি কাউণ্ট মোঁতো নাভাইয়ের মেয়ে। আমার বাবা ষোড়শ লুইয়ের দরবারে ছিলেন। বিপ্লবের ঠিক আগেই আমরা ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম, নইলে আর সকলের মত আমাদেরও প্রাণদণ্ড হতো। এদিকে পারিবারিক বিষয়গুলি দেখাশোনার জন্যে ফ্রান্সে একজনের যাওয়া দরকার। তাই আমি ছদ্মনামে যাত্রা করি..."

"মাদাম ফ্রাঁসোয়া!" রবার্ট সাহায্য করে।

"হ্যাঁ" ভাই-কাউন্টেস্ হাসলেন, "মাদাম ফ্রাঁসোয়া। সেইবারেই আমি আপনার পাসপোর্টের ব্যাপারে সাহায্য করি। আমার পক্ষে



প্রফুল্ল মনে সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে রবার্ট আমেরিকায় ফিরে এল

যাত্রাটা বিপজ্জনক ছিল। প্যারিসে যখন দ্বিতীয়বার আমাদের সাক্ষাৎ হয় তখনো আমার সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

তারপরে সত্যি সত্যিই আমার বিয়ে হয়েছে। আমি এখন ভাই-কাউন্ট গোঁতোবিরেঁার স্ত্রী।"

"আচ্ছা—", রবার্ট বললো, "বেশ,—এই রহস্য যে শেষে উদ্‌ঘাটিত হল তাতে আনন্দিত হলাম।" বক্সের অন্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করে রবার্ট তার নিজের জায়গায় ফিরে এল। এই ওর সঙ্গে তার শেষ দেখা।

ইতিমধ্যে এক ধনী ইংরেজ বিধবার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তাকে সে বিবাহের প্রস্তাব করার কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিল। মিঃ এবং মিসেস বার্লোকে একথা সে লিখলো। তাঁরা সত্ত প্যারিস থেকে আমেরিকা ফিরে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। বার্লো ইংরেজ বিধবাটিকে বিবাহ না করবার জন্যে একান্তভাবে অনুরোধ জানিয়ে লিখলেন যে মেয়েটির শিক্ষাদীক্ষা হাবভাব ইংরেজদের মতই। "আর তোমার পক্ষে যেটা বোধ হয় সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় তা হল ওর বিষয়সম্পত্তি আছে।" বার্লো বলেন যে আমেরিকায় ইংরেজ মেয়ে কখনো সুখী হতে পারে না আর রবার্টও ইংল্যাণ্ডে কখনো সুখী বোধ করবে না। তিনি লেখেন, "আর ওর সম্পত্তির সম্বন্ধে বলতে পারি সে পৃথিবীর সমস্ত অর্থের অধিকারী হওয়ার চাইতে এখন তুমি যেমন আছ সেইভাবেই বরং আমি তোমায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত।"

সুতরাং ইংরেজ বিধবাটিকে রবার্ট বিয়ে করলো না। তার বদলে সে আমেরিকায় ফেরার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। তার ফেরার পথে জাহাজটার যদি কিছু হয় সেইজন্যে সে বার্লোকে লিখল যে তার সাবমেরিন আর বাষ্পীয় জাহাজের সমস্ত নকশা ইংল্যাণ্ডেই

থাকবে। নিজের উইলসুদ্ধ সে সব সে একটা টিনের খোলে ভর্তি করে জেনারেল লিম্যান নামে এক বন্ধুর কাছে রেখে গেল। বার্লোকে সে অনুরোধ জানাল যে তার গৃহযাত্রার পথে যদি কিছু ঘটে ত তিনি যেন তার আবিষ্কারের সমস্ত কাহিনী প্রকাশ করেন। কিভাবে তার সাবমেরিন আর বাষ্পীয় জাহাজ সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা এনে দেবে সে কথা যেন পৃথিবীর লোকে জানতে পারে, এই ছিল রবার্টের ইচ্ছা।

বাড়ি ফেরার পথে কোন বিপদ হয় নি, কিছু ঘটেও নি। রবার্টের জাহাজ আমেরিকার তীরবর্তী হতেই স্বদেশ সম্বন্ধে তার হৃদয়ে এক গভীর অনুভূতি জেগে উঠল। বিশ বছর পরে আজ সে তার আপনার জনদের কাছে ফিরে আসছে—তার দেশের চিরপরিচিত দৃশ্য আর শব্দের সান্নিধ্যে। এ অভিজ্ঞতা মনকে অভিভূত করে। ১৮০৬-এর ডিসেম্বরে সে যখন জাহাজ থেকে নামল তখন বাতাসটাকেও যেন অন্য রকম মনে হল। মন তার প্রফুল্ল আর দীর্ঘকাল এত ভাল স্বাস্থ্যও তার হয়নি। তার পেছনে চ্যান্সেলার লিভিংস্টনের অর্থের জোর রয়েছে। এখন তার জীবনের বৃহত্তম কর্তব্য সমাপন করবার মত ক্ষমতা নিজের হয়েছে বলে মনে হল—সেটি হল ক্লেরমণ্ট নামে নর্থ রিভার স্টীম বোটটি তৈরি করা।

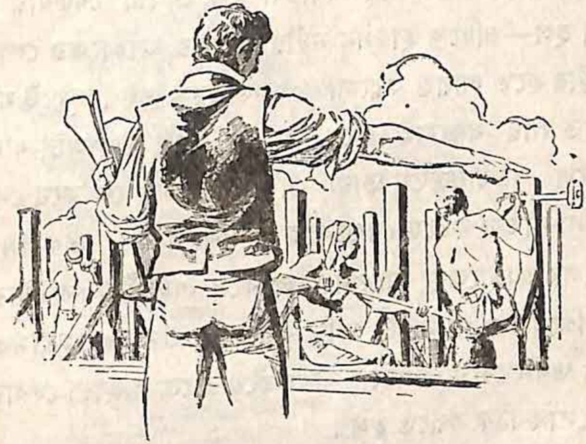
ক্লেরমণ্টের ঐতিহাসিক যাত্রা

দেশে নেমেই রবার্ট চললো ওয়াশিংটনে যেখানে মিঃ বার্লো বাস করছিলেন। প্যারিস ছাড়বার পর সে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁকে সবিস্তারে বলল। হাডসন নদীতে তার নতুন জাহাজের প্ল্যান সম্বন্ধে আলোচনা করল। চিরকালকার মতই মিঃ বার্লো সাগ্রহে শোনেন এবং বুদ্ধিমানের মত পরামর্শ দেন। যিনি প্রকৃত-পক্ষে তার পিতৃতুল্য হয়ে গিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে ছুটি উপভোগ করবার সময় রবার্ট বার্লোর জমির মাঠের মধ্যে সানন্দে একটি গ্রীষ্মাবাস তৈরি করে দেয়।

কয়েক মাসের মধ্যেই সে নিউ ইয়র্কে ফিরল তার নতুন স্টীম বোট তৈরি দেখাশোনা করতে। নিউ ইয়র্কের ইস্ট রিভারের ওপর করলিয়াস্ হুক্ এবং চার্লস্ ব্রাউনের জাহাজ তৈরির কারখানায় সেটা তখন তৈরি হচ্ছে। তার অমূল্য স্টীম ইঞ্জিনটি বুলটন অ্যাণ্ড ওয়াটের কারখানা থেকে বাক্সবন্দী হয়ে আটলান্টিক পেরিয়ে এসে পৌচেছে। সে আনন্দে ক্রিসমাসের উপহারের মত সেটিকে বাক্স খুলে বার করল।

১৮০৭-এর বসন্তে সে এসে পৌছয় আর বসন্তকালই হল জাহাজ

তৈরির উপযুক্ত সময়। সমুদ্র থেকে যে নোনা হাওয়া বয় তার তীব্রতা কমে এসেছে। জাহাজের খোলের কাঠ জোড়া দেবার সময় সূর্যের তেজে ছুতোর মিস্ত্রিদের আঙ্গুলগুলো আর জমে যায় না। হাজার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে রবার্ট ব্যস্ত। জাহাজ তৈরির কাজ এগোনয় সে এতই উৎসাহী যে সেখান থেকে ছুটি নিতেও সে পারে না। তাছাড়া কারিগরেরা সর্বদাই নানারকম প্রশ্ন করে। পালের



রবার্ট তার নতুন বাষ্পীয় পোতের নির্মাণের কাজ তদারক করছে

জাহাজ তৈরির জন্যে তাদের কোন উপদেশ দেবার দরকার হয় না— কিন্তু কয়েক টন যন্ত্রপাতি ধরে এই রকম শক্ত জাহাজ তৈরির অভিজ্ঞতা আমেরিকায় আর কার আছে?

অবশেষে জাহাজ তৈরি শেষ হল। পালের জাহাজের মাঝি-মাল্লারা এর প্রস্তর যুগের বিরাট এক ডিঙ্গির মত চেহারা দেখে হাসাহাসি করে। রবার্টের জাহাজ লম্বায় ১৫০ ফিট আর চওড়ায়

মাত্র ১৩ ফিট। ব্রাউনের জাহাজের কারখানা থেকে নিউ ইয়র্কের হাডসন নদীর ধারে পলাস্ হুক্-এর ফেরীর দিকে যখন এটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন একে সাপের মত দেখাচ্ছিল। রবার্ট সেখানে একটা কারখানা বসিয়েছিল। জাহাজটা দেখে বেশ খুশী হয়। এখন যাতে সবচেয়ে ভালভাবে কাজ হয় সেইভাবে ইঞ্জিন আর প্যাড্‌ল্ হুইল বসানোর দুষ্কর কাজটি শুরু হল।

ক্রমে ইঞ্জিনের বয়লার বসানো হল, ধোঁয়া বেরুবার চিমনী লাগানো হল—ওদিকে হাডসন নদীর পালের জাহাজের লোকেদের মুখও গম্ভীর হতে আরম্ভ করলো। কেউ কেউ এই বিদ্‌ঘুটে যন্ত্রটাকে ভয় করত আর সকলেই হিংসে করত। এই জাহাজটা যদি সফল হয় তাহলে পুরুষানুক্রমে তারা যে পালের জাহাজে করে লোকজন নিয়ে আসা-যাওয়া করছে সেগুলোর কি দশা হবে! একদিন রাত্রে এক পালের জাহাজের কাপ্তেন ইচ্ছে করে এই স্টীম বোটটার গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে এর খানিকটা ক্ষতি করলো। সে সব মেরামত করা হল আর তখন থেকে রবার্টকে বাধ্য হয়ে রাত্রে পাহারা দেবার জন্যে একজন লোক ঠিক করতে হল।

জাহাজের আবিষ্কর্তা এদিকে যখন জাহাজ তদারকে ব্যস্ত তখন তার অংশীদার চ্যান্সেলার লিভিংস্টন প্যারিস থেকে ফিরে এসে নিউ ইয়র্কের রাজধানী আলবানিতে কাজে ব্যস্ত। কয়েক বছর আগে রাজ্য সরকার তাঁকে বিশ বছরের জন্যে নিউ ইয়র্কের জলপথে বাষ্পীয় জাহাজ চালাবার একচেটিয়া অধিকার দেন। শর্ত ছিল তাঁর তৈরি জাহাজটি যেন ঘণ্টায় চার মাইল যেতে পারে। যদিও তিনি তখনো এ ধরনের কোন জাহাজ তৈরি করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর ভরসা

ছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই তা পারা যাবে। সুতরাং তিনি শর্ত পূর্ণ করবার জন্যে আরো সময় চান। সে অনুরোধে রাজ্য সরকার সম্মতি দেন।

ইতিমধ্যে অংশীদারদের অর্থ-সামর্থ্য কমে আসছিল। রবার্ট যা হিসেব করেছিল, জাহাজ তৈরি করতে খরচ তার চেয়ে বেশী পড়ছিল। আর এদিকে স্টীম বোট তৈরির ব্যাপারে টাকা ঢালতে রাজী এমন



ক্লেরমণ্ট

লোক পাওয়া অসম্ভব বললেই চলে। পরে রবার্ট বলত, "আমার কাজের পথে কখনো একটি উৎসাহের কথা, কি উজ্জ্বল আশার বাণী বা আন্তরিক সদিচ্ছার ছায়াও পড়েনি।" অনেকেই তাকে আবিষ্কর্তা হিসেবে, পাগল না হলেও কেমন যেন মনে করত। কিন্তু আগেও

সে অতি সামান্য সাহায্য নিয়েই চালিয়ে এসেছে, আর এখনো এই অংশীদার দুজন কোনমতে কাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম হল। অতিরিক্ত অর্থেরও জোগাড় হল আর "নর্থ রিভার স্টীম বোট" নামে জাহাজটিও সম্পূর্ণ হল।

ইঞ্জিন বসাবার পর এখন এটাকে অবিশ্বাস্য রকমের বিদ্‌ঘুটে বলে মনে হতে লাগল। এর পাটাতনটা আগাগোড়া সমান। বয়লারটা সম্পূর্ণ দেখা যায়, আর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক ধোঁয়া বেরুবার নল বা চিম্‌নী। ইঞ্জিনটা আর তার সঙ্গে ডাণ্ডা দিয়ে জোড়া প্যাড্‌ল্ হুইল দুটোও দুপাশে ঝুলছে। সেটাও বাইরে থেকে দেখা যায়। রবার্টের কাছে কিন্তু এই বাষ্পীয় পোতটি অতি সুন্দর বলে মনে হচ্ছিল। পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে সে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

৯ই আগস্ট প্যারিসে তার প্রথম বাষ্পীয় পোত চালানোর ঠিক চার বছর পরে, সে প্রথম এটা পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখলো। সেদিন ভোরবেলা আগুন লাগানো হল। দুপুর নাগাদ বাষ্পের তেজ বেড়ে উঠল, দেখা গেল যন্ত্রপাতির প্রতিটি অংশ ঠিক চলছে। এবার থ্রট্‌ল্ খুলে দিতেই বোট জেটি থেকে এগোতে শুরু করলো। চিম্‌নী দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল আর আশেপাশের বাড়ি আর জেটিগুলো থেকে লোকে শত চক্ষু মেলে অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। রবার্ট এটা নদীর ওপর মাইল খানেক চালিয়ে নিয়ে গেল, তারপর থেমে প্যাডল্ হুইলের বিভিন্ন দাঁড় বা ব্লেডগুলো পরীক্ষা করে দেখলো। সব ঠিক আছে দেখে সে জাহাজটা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনলো।

তারপর কয়েকদিন ধরে সে শেষবারের মত সব কিছু ঠিকঠাক করতে লেগে গেল যাতে ১৭ই আগস্ট এর আলবানি পৌঁছবার জন্যে প্রথম যাত্রা শুরু করা যায়। যাত্রাপথ ১৫০ মাইল দীর্ঘ। কয়েক-জন যাত্রীও এতে থাকবেন—চ্যান্সেলার লিভিংস্টনের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়বর্গ। এঁরা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। ১৭ই আগস্ট সোম-বার আর তার পরের ক'টি দিন হয় তার জীবনের বৃহত্তম দিন হবে, নয়ত হবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যময়। জাহাজ আলবানিতে পৌঁছলে সেও তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। যদি না হয়—যদি কিছু বিকল হয় —না, সে চিন্তা করে সে সময় নষ্ট করতে চায় না।

সেই ঐতিহাসিক দিনের ভোরে উঠে রবার্ট আবার ইঞ্জিনটা দেখে নিল, আগে যেমন সে হাজার বার দেখেছে। মাঝিমাল্লারাও দেখতে দেখতে জাহাজে এসে উঠল। ইঞ্জিনীয়ার বয়লারে জ্বালানী কাঠ ধরাল। ডেকের ওপরের বিরাট স্তূপ থেকে কাঠ এনে চুল্লীতে ক্রমে ফেলা হল। বেলা একটু বাড়তেই সেটা গন্‌গনে আগুনে লাল হয়ে উঠল। সমস্ত ভাল্‌ভ্‌ আর নলের মুখ দিয়ে শোঁ শোঁ করে বাষ্প বেরুতে থাকে। বাইরে প্রকাশ না করলেও শেষ নির্দেশগুলো দেবার সময় রবার্ট উত্তেজনায় আড়ষ্ট কাঠ হয়ে উঠেছিল।

দুপুরের খানিক আগে জেটি পথের দুধারের সম্মিলিত জনতার ভীড় ঠেলে যাত্রীরা আসতে শুরু করলেন। সকলেই সুসজ্জিত, যেন সুন্দর এক রবিবারের বিকেলে ড্রইং রুম বা গাড়ি থেকে এইমাত্র বের হলেন। মহিলাদের মাথায় বনেট আর পরণে সূক্ষ্ম গাউন। পুরুষদের পরণে কড়া ইস্ত্রির ফুলকাটা হাতা আর কলারওয়ালা জামা

এবং ওয়েস্ট-কোট। সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী তাঁদের চালচলন সোজা এবং আভিজাত্যপূর্ণ। কিন্তু দর্শকবৃন্দের মতে জাহাজের অতগুলি লোকের মধ্যে পেনসিলভ্যানিয়ার সেই কৃষকের ছেলেটিই যেন সকলের চাইতে সুন্দর দেখতে। তার "ভদ্র, পুরুষোচিত ভাব, কোথাও অস্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই। লম্বায় ছ ফুটেরও কিছু বেশীই, ছিপছিপে কিন্তু প্রাণশক্তিতে পূর্ণ গঠন আর মানানসই পোশাক, মাথা ভর্তি ঘোর বাদামী রঙের চুল," এই সব মিলিয়ে ভিড়ের মধ্যে সহজেই রবার্টকে নজরে পড়ে।

জাহাজে ওঠার সময় যাত্রীদের কেমন যেন ভীত আর দুঃখিত দেখাচ্ছিল। চ্যান্সেলারের সুন্দরী ভাইঝিটিই কেবল রবার্টের দিকে স্মিত মুখে তাকিয়ে ছিল। সে ছাড়া কেউই এতে চড়তে চায়নি। তাঁদের মনে হচ্ছিল, এতে কেবল যে প্রাণের ভয় রয়েছে তাই নয়, তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাও বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তীরবর্তী জনতা হট্টগোল করে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবে বা তার চেয়েও খারাপ—হো হো করে হাসতে থাকবে, এর চেয়ে অপমানকর আর কি হতে পারে! কিন্তু পরিবারের কর্তা চ্যান্সেলার লিভিংস্টনের জন্যে এ কাজ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন, সেইজন্যে এ সব সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

বেলা একটা নাগাদ সমস্ত যাত্রীই জাহাজে উঠে পড়লেন। রবার্ট জাহাজ ছাড়বার তোড়জোড় করবার জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগল, নল দিয়ে মেঘের মত ধোঁয়া বেরুতে থাকে। মাঝে মাঝে ছেলেদের ধবধবে ফুলকাটা সার্টের বুকে আর মেয়েদের টুপিতে এসে পড়ে। যাত্রীরা অসন্তুষ্টভাবে মুখ গোমড়া করে থাকেন।

রবার্টের মনে পড়ে, "জাহাজ ছাড়বার হুকুম দেবার সময় এল। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা ডেকের ওপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মধ্যে ভয় মিশ্রিত উৎকণ্ঠা। তাঁরা নির্বাক, বিষণ্ন আর ক্লান্ত। তাঁদের চেহারায় আসন্ন দুর্ঘটনার ছাপ ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না। এই প্রচেষ্টার জন্যে আমার প্রায় অনুতাপই হচ্ছিল।"

ছাড়বার সঙ্কেত দেওয়া হল। দড়িদড়া ছুঁড়ে ফেলা হল, প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ভাল্‌ভ্‌ খুলে দিলেন। ভারী এঞ্জিনটা চলতে শুরু করল। জাহাজ ডক থেকে বেরিয়ে মাঝ-দরিয়ার দিকে চলল। হঠাৎ ইঞ্জিনটা ঘসঘস করেই থেমে গেল আর জাহাজটাও স্রোতের মুখে ঘুরে গেল। যাত্রীদের মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল।

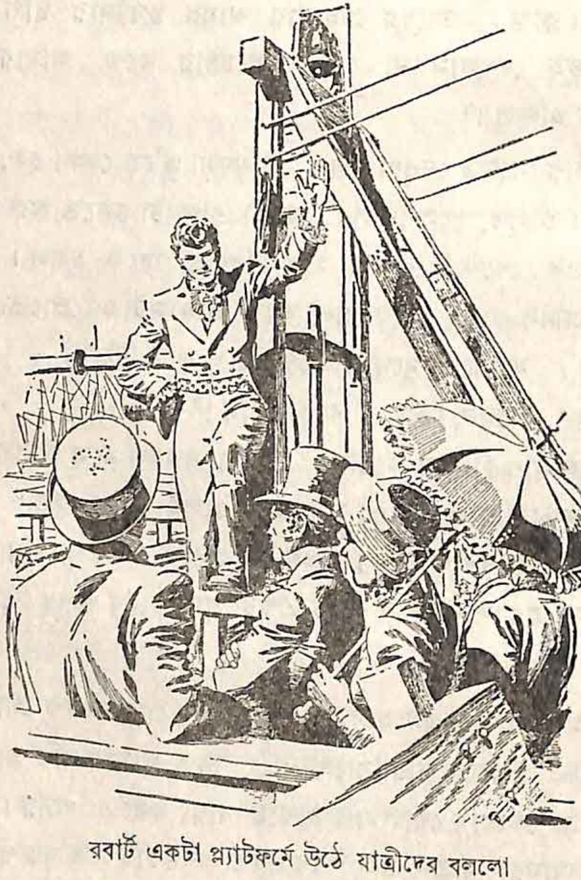
একজন বললেন, "হুম্‌। বলেছিলাম!"

"কি আহাম্মকীই না করেছি।" আর একজন বলে উঠলেন।

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড! এর মধ্যে না এলেই ভাল হত," তৃতীয় এক ব্যক্তি ফোড়ন কাটেন। এই সব শুনতে পেয়ে আর যাত্রীদের মুখে বিদ্রোহের ভাব দেখে রবার্ট একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে হাত তুললো।

"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, যন্ত্রপাতির কোথায় কি গোলমাল হয়েছে ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু আমায় যদি আধ ঘণ্টা সময় দেন ত কোথায় গোলমাল হয়েছে বার করতে পারি। তার পর হয় আমরা যাত্রা শুরু করব নয়ত এখনকার মত বন্ধ রাখব।" কেউ কোন আপত্তি তুললো না, অন্তত মুখে। রবার্ট আর ইঞ্জিনীয়ার যন্ত্রপাতির দিকে ছুটল। গোলমালটা দেখা গেল সামান্য একটু

পরিবর্তনের ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে তা ঠিক করা হল। তার পরেই চাকাগুলো আবার ঘুরতে লাগল। জাহাজের গলুইও আবার ঘুরে গিয়ে উত্তর দিকে তার যাত্রাপথে এগোতে শুরু করলো।



রবার্ট একটা প্ল্যাটফর্মে উঠে যাত্রীদের বললো

জাহাজের গতিবেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরের জনতার মধ্যে থেকে হাততালি আর শিস-এর শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়, আর

যাত্রীদের মুখেও ভয়ের বদলে পূর্ণ বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে। তাঁরা যে হাওয়া আর স্রোতের বিপক্ষে চলেছেন সেটা তাঁদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তবু তাঁদের পায়ের কাছেই ইঞ্জিনটা নিশ্চিন্তভাবে ঝকঝক করে চলেছে, এদিকে ডাইনে দূরে নিউ ইয়র্কের তীরভূমি তাঁদের কাছ থেকে আরো দূরে ভেসে চলে যেতে থাকে।

পাঁচ দশ কুড়ি—চল্লিশ মিনিট কেটে যায়। স্টীম বোট অনেক দূরে শহর ছাড়িয়ে চলে এসেছে। এখন দুপাশে খাড়া রুক্ষ পাহাড়ের মাঝ দিয়ে রূপোলী নদী বেয়ে উত্তর মুখে চলেছে। যাত্রীদের আর ভয় নেই। ক্রমে, অগ্রগতিতে তাঁদের বিস্ময়ের বদলে উৎসাহ এবং তার পর তাঁদের স্বাভাবিক স্ফূর্তি দেখা দিয়েছে। এখন জাহাজের পেছন দিকে একটি দল গান জুড়ে দিয়েছেন। আর কোন অভিনন্দনই রবার্টের কাছে এত বড় বলে মনে হত না, কারণ তাদের মিলিত কণ্ঠে রবার্টের প্রিয় স্কটিশ সুরটিই শোনা যাচ্ছিল।

দুধারে ঢালু ফুল বাগিচায় কেমনে ফুল ফোটে
পাখনা মেলে পাখিরা সব কেমনে গান গায়
নতুন ফোটা ফুলের গন্ধ চৌদিকেতে ছোটে
হেথায় বসে একলা আমার পরাণ ফেটে যায়।

রবার্টের চোখে যদি জল এসে পড়ে ত তাকে দোষ দেওয়া যায় কি? বছরের পর বছর ধরে তিক্ত পরাজয় আর আত্মত্যাগ আজকের এই যাত্রাকে আরো বেশী জয়যুক্ত করে তুলল।

চ্যান্সেলারের ভাইঝি হ্যারিয়েট লিভিংস্টন তার দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে। এই জাহাজ যদি সাফল্য অর্জন করে তবেই না তার মত পেনসিলভ্যানিয়ার কৃষকের ছেলে এই সুন্দরী মেয়েটিকে

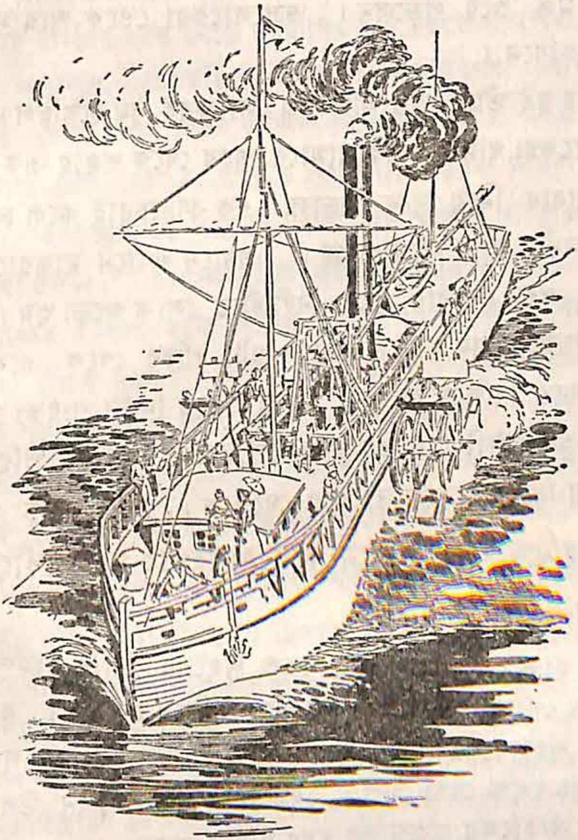
বিয়ের আশা করতে পারে! কিছুকাল আগে যখন সে কোন মতে সাহস সঞ্চয় করে চ্যান্সেলারকে বলে ফেলে, "মিস্ হ্যারিয়েট লিভিংস্টনকে যদি বিয়ে করতে চাই তবে কি আমাকে আপনি খুব দুঃসাহসী মনে করবেন?"

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে চ্যান্সেলার বলেছিলেন, "মোটেই না! ওর বাপ অবশ্য আপত্তি করতে পারে কারণ তুমি নিম্ন বংশের গরীব আবিষ্কারক বলে, পরিবারের আর সকলেও আপত্তি তুলতে পারে। কিন্তু হ্যারিয়েটের যদি আপত্তি না থাকে (ওর মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বলেই মনে হয়) ত তুমি এগিয়ে যাও। আমার শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ রইলো।"

এখন তার বাষ্পীয় পোতের প্রথম দীর্ঘ যাত্রার ওপর রবার্টের ভাগ্য কতখানি নির্ভর করছিল। অতি দুর্বল রোগীর ওপর ডাক্তার যেমন করে নজর রাখেন সেই ভাবে সে এই যাত্রী নিয়ে চলার সময় কান পেতে বয়লার আর ইঞ্জিনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে থাকে!

পরের কঘণ্টা ধরে জাহাজ নির্ঝঞ্ঝাটে হাডসনের ওপর দিয়ে ঝক্‌ঝক করে এগিয়ে চলল। এখন চতুর্দিকে বিরাট দৃশ্য। কখনো বা নির্জন স্থান। ক্বচিৎ কখনো তীরে পালের জাহাজ থামবার জায়গার কাছে গ্রাম দেখা যায়। নদীপথ গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে। পাহাড়ের গম্ভীর চূড়া নদীর দুপাশে শত শত ফিট ওপরে। এখানে ওখানে নিস্তব্ধ বনানী নদীর তীর পর্যন্ত চলে এসেছে। ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ আর প্যাড্‌ল্ হুইলের জলোচ্ছ্বাস ছাড়া একমাত্র শব্দ শোনা যায় সিন্ধু শকুনের করুণ ক্রন্দন বা নিঃসঙ্গ কোন সারসের ডাক।

ছায়া দীর্ঘতর হবার সঙ্গে সঙ্গে নদীতে সন্ধ্যার আকাশের কোমল রঙ ধরে। তীরভূমি ধোঁয়াটে অস্পষ্ট হয়ে আসে। দেখতে দেখতে



জাহাজ নির্ঝঞ্ঝাটে হাডসনের ওপর দিয়ে ঝক্‌ঝক করে এগিয়ে চলল

জাহাজ আর তার যাত্রীবর্গ নদীর ওপর একা চলতে থাকে। কেবল চিমনীর উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ আর মাঝে মাঝে আগুনের চুল্লীর [illegible]

আভা অন্ধকার বিদীর্ণ করে জল আর তীরবর্তী গাছপালার ওপর বিচিত্র সঞ্চারি নকশার সৃষ্টি করে। উত্তেজনায় ক্লান্ত কিন্তু তৃপ্ত যাত্রীবর্গ রাত্রের মত শুয়ে পড়লেন। ভদ্রলোকেরা ডেকে আর মহিলারা নিচের কেবিনে।

নদীর দুই তীরে কিন্তু অতি অল্প লোকেরই ঘুম হয়েছিল। ঘোড়ায় চড়ে লোকেরা খামার থেকে খামারে, শহর থেকে শহরে এক আতঙ্কজনক সংবাদ নিয়ে ঘুরে বেড়াল, "এক কাঁঠচেরাই কলে চড়ে স্বয়ং শয়তান নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে।" এখানে ওখানে মাঝরাতে এই ভৌতিক দৃশ্য দেখবার জন্যে নদীতীরে লোক জড়ো হয়। তারা দেখতে পায় আগুন ছড়াতে ছড়াতে ওটা দক্ষিণ থেকে এসে ক্রমে ধীরে উত্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নদীর উত্তরে নির্জন পার্বত্য খামারে, যেখানে এই বাষ্পীয়পোতের খবর পৌঁছয়নি, সেখানে পরিবারসুদ্ধ লোক এর দিকে আতঙ্কে তাকিয়ে থেকেছে। কেউ কেউ পৃথিবীর শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে মনে করে আত্মরক্ষার জন্যে গভীর জঙ্গলে পালিয়েও গিয়েছে।

সকাল হতে দেখা গেল নিউ ইয়র্ক শহরের পঁচাশি মাইল উত্তরে এই বাষ্পীয় পোত তখনো ঝক্‌ঝক করে এগিয়ে চলেছে। যাত্রীদের অনেকেই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েছেন, কারণ নদীতীরে অনেক বিচিত্র দৃশ্য দেখা গেল। এতক্ষণে সমস্ত হাডসন উপত্যকায় ফুল্‌টনের জাহাজের অগ্রগতির খবর ছড়িয়ে পড়েছে। যারাই কোন গাঁয়ের জেটিতে বা নদীর ধারে কোন টিলার ওপর হাজির হতে পেরেছে তারাই দেখা গেল রুমাল উড়িয়ে খুব চীৎকার করছে।

বেলা একটার সময় নদীর দক্ষিণতীরে গাছপালার ফাঁকে বহু

দূরে চ্যান্সেলার লিভিংস্টনের জমিদারী ক্লেরমণ্ট (যার থেকে পরে জাহাজটির নামকরণ হয়) দেখা গেল। চ্যান্সেলার ডেকের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে যাত্রীদের চুপ করতে বললেন।

তিনি বললেন, "ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ইতিহাসের এক মহান্ ঘটনায় অংশগ্রহণ করেছেন। নিউ ইয়র্ক ছাড়বার পর একটি বাষ্পীয় পোতে আপনারা ১১০ মাইল ভ্রমণ করেছেন। ইতিপূর্বে এ ধরনের ভ্রমণ কেউ করেনি বা তার কোন চেষ্টাও করা হয়নি।" চ্যান্সেলারের কথা জয়ধ্বনিতে ডুবে গেল। তিনি আবার নিস্তব্ধ হতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর বললেন, "রবার্ট, এ দিকে এস।" শান্ত, বিনম্রভাবে লিভিংস্টনের পাশে দাঁড়াতেই সকলের চোখ গিয়ে পড়ল রবার্টের ওপর।

চ্যান্সেলার বললেন, "এই তরুণটি যে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে তা এতই দুঃসাধ্য যে সেই চেষ্টায় বহুলোকের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আমাদের যুগের এইটিই হল সবচেয়ে বড় ঘটনা। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, এই শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই বাষ্পচালিত জাহাজে ইউরোপে যাওয়া সম্ভব হবে। আমার আনন্দ যে এই জাহাজটি তৈরির ব্যাপারে আমারও কিছুটা অংশ আছে। কিন্তু আপনাদের দেয় সম্মান এই ভদ্রলোকেরই প্রাপ্য, কারণ মানুষের উপকারী বন্ধু হিসেবে ইতিহাসে এঁরই নাম থাকবে। এই জাহাজটি বাস্তবিকই একটি মাত্র লোকের পরিশ্রমের ফল—সে হল রবার্ট ফুল্‌টন।"

রবার্টের কানে দীর্ঘকাল ধরে করতালি আর জয়ধ্বনি বাজতে লাগল। "আর একটু," চ্যান্সেলার বললেন, "এখনো শেষ হয়নি। এমন দিন আর আসবে না—আর একথা জানাতে আমি গর্ব বোধ

করছি যে এই সঙ্গে আমার ভাইঝি মিস্ হ্যারিয়েট লিভিংস্টন আর মিঃ রবার্ট ফুল্টনের বিয়ের বাগ্দান ঘোষণা করলাম।" জলের ওপর আর একবার জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তটিতে এই সবের ফলে আভিভূত হয়ে রবার্ট কোন-মতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু হাসলো। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। একজন যাত্রীর মতে মুখ তার তখন, "ভালবাসা আর প্রতিভার ছাপে উজ্জ্বল।"

"ক্লেরমন্ট" এখন চ্যান্সেলারের জমিদারীর ঠিক পাশে এসে উপস্থিত। ধীরগতিতে এঞ্জিন বন্ধ করা হল। তখনি নোঙর ফেলা হ'ল। দেখতে দেখতে জাহাজ অগভীর জলে এসে পৌঁছল। সমস্ত যাত্রীরা ছোট ছোট নৌকোয় করে তীরে উঠলেন। চ্যান্সেলারের বাগানবাড়িতে তাঁরা রাত কাটাবেন।

পরদিন সকালে তাঁরা ভোরে উঠেই যাত্রার শেষ অংশটুকু সম্পূর্ণ করবার জন্যে "ক্লেরমণ্টে" ফিরলেন। নটার সময় নোঙর তোলা হল, চাকা ঘুরতে শুরু করল। বকেল পাঁচটায় স্টীম বোট আলবানি পৌঁছলো। সেখানে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক জনতা জয়ধ্বনি দিলো।

ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত বাষ্পীয় পোত ভ্রমণ শেষ হল।

১১

"শেষে কি প্রাণটা খোয়াবে"

মিঃ বার্লো "কেরমণ্টে" উপস্থিত ছিলেন না, রবার্ট তাই এক দীর্ঘ পত্রে এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের বিবরণ দেয়। সে বলে যে বত্রিশ ঘণ্টায় তারা অল্প বাতাসের বিরুদ্ধে ১৫০ মাইল এগোয়। ছোট জাহাজ আর শ্লুপগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল সেগুলো যেন নোঙর করা রয়েছে। নিউ ইয়র্ক ছাড়বার সময় মনে হয়েছিল যে তার জাহাজ ঘণ্টায় এক মাইল চলতে পারবে বলে বিশ্বাস করার মত লোক সারা শহরে জনা তিরিশেক আছে কিনা সন্দেহ। সে লেখে, "জেটি ভর্তি দর্শকের সামনে আমরা যখন যাত্রা শুরু করি তখন অনেক বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনী কানে এল।"

সেই চিঠিতেই রবার্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে যে এই বাষ্পীয় জাহাজে, "সস্তায়, অল্প সময়ের মধ্যে মালপত্র নিয়ে মিসিসিপি, মিস্তুরী আর অন্য সব বড় বড় নদীপথে যাওয়া যাবে। এদের ঐশ্বর্য আমাদের দেশের লোকের কাছে উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে।"

চোখে দেখলে তবে বিশ্বাস হয়। বহুসংখ্যক লোক হাডসন নদীপথে জাহাজটি যেতে দেখেছিল। তার নিজের ভরসা থাকা সত্ত্বেও রবার্ট জানত যে "ক্লেরমণ্ট" এখনো নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ

করতে পারেনি। অনেকেরই মনে হয়েছিল যে জাহাজটা একবার না হয় আলবানি পৌঁছতে পেরেছে, কিন্তু পরের বার তা নাও পারতে পারে। এর একটা কারণ হ'ল নতুন আবিষ্কারের প্রতি সে যুগের লোকের মনোভাব এখনকার লোকের মত ছিল না। আজকে আমরা যে কোন নতুন ধারণাই উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকি। তখন কিন্তু লোকে নতুন কোন উদ্ভাবনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখত। একথা মনে রাখা দরকার যে প্রথমবারের যাত্রীরা সকলেই ছিলেন অতিথি। এঁরা কতকটা চ্যান্সেলার লিভিংস্টনের আদেশেই যাত্রা করেন। এখন প্রশ্ন হল, জনসাধারণ কি বাষ্পীয় পোতে আলবানি যাবার নির্ধারিত ভাড়া, সাতটি ডলার দিতে রাজী হবে ?

প্রায় একমাস কেটে যাবার পর ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর "ক্লেরমণ্ট" তার প্রথম ভাড়াটে যাত্রী নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন যাত্রীদের মধ্যে জন, কিউ. উইল্‌সন্‌ নামে একজন কোয়েকার ছিলেন যিনি তাঁর স্মৃতিকথা লিখে যান। না হলে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারতাম না।

উইল্‌সনের যাওয়ার বাসনা জানতে পেরে তাঁর এক বন্ধু বলে উঠলেন, "এই জন্যে শেষে তুমি কি প্রাণটা খোয়াবে! আমি বলে দিচ্ছি ওটা একটি ভীষণ রকম বন্য জন্তু। তোমার বাবার উচিত তোমায় নিরস্ত করা।" ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভোরে জেটিতে গিয়ে উইলসন দেখলেন, "ক্লেরমণ্ট"-এর কাছাকাছি প্রত্যেকটি জেটি, রাস্তা জানালা মায় বাড়ির ছাদ অবধি লোকে ভর্তি। জাহাজ যাত্রার জন্যে তৈরি। চিম্‌নী দিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে, "আর

ইঞ্জিনের প্রতিটি ভাল্‌ভ্ আর ফুটো দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে বাষ্প বেরুচ্ছে।" জাহাজের পেছন দিকটায় মহিলাদের কেবিনের দরজার পেছনে হালের কাছে পরিচালক দাঁড়িয়ে।

উইলসন বলেছেন রবার্ট ফুল্‌টন সেখানে ছিল। "তাঁর আশ্চর্য-রকম পরিষ্কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সমস্ত লোকের গুঞ্জন আর ইঞ্জিনের কাজ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল। তাঁর প্রতিটি কাজেই আত্মবিশ্বাস আর নিশ্চয়তার ভাব। অন্যদের ভীতি, সন্দেহ বা বিদ্রূপের প্রতি তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।"

যাত্রার মুখে ঠিক প্রথমবারের মত আবার বিলম্ব ঘটল। জাহাজে যাত্রী ছিল প্রচুর। তাদের সকলকেই বিচলিত দেখা গেল। তখন রবার্ট বললো, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কাল বেলা বারোটার আগেই আপনারা আলবানি পৌঁছবেন।"

শেষে সব ঠিক হয়ে গেলে ইঞ্জিন চালান হল, "জাহাজ নির্দিষ্ট গতিতে ধীরে ধীরে জেটি থেকে বার হল," উইল্‌সনের মনে পড়ে। "মাঝ দরিয়ায় পড়তেই এমন এক জয়ধ্বনি উঠল যে তেমনটি আর কখনো শোনা যায়নি।"

সুষ্ঠুভাবেই সব কিছু চলল। হ্যাভারস্ট্র উপসাগরে ছোট্ট একটা নৌকোয় একজন লোককে অপেক্ষা করতে দেখা গেল। লোকটি ক্লেরমণ্টে উঠতে চাইলো। রবার্ট একটা দড়ি ফেলে তাকে তুলে নিল। লোকটা দেখা গেল একেবারে উজবুক, একটা মিলে কাজ করে। কে যেন তাকে বলেছে যে "ক্লেরমণ্ট" একটা আটা ময়দা পেষার কল। তাই স্টীমারে উঠেই সে বলল, "নদীতে ভেসে যাওয়া কল সম্বন্ধে কিছুই জানত না, তাই দেখতে এলাম।"

স্টীমারে এক আইরিশ যাত্রী ছিলেন। তিনি একটু মজা করবার সুযোগ পাওয়া গেছে দেখে লোকটাকে নিয়ে "ক্লেরমণ্ট"-এর ইঞ্জিনটা দেখালেন। তখন খুব খুসী হয়ে লোকটা বললে, "এবার যাঁতাটা একটু দেখতে চাই।"

আইরিশ ভদ্রলোক তখন রবার্টকে দেখিয়ে বললেন, "সেটা গোপন ব্যাপার ; মালিক এখনো আমাদের কিছু বলেন নি। তবে আলবানি থেকে গমের বোঝা নিয়ে যখন ফিরব তখন যদি একবার আস ত দেখবে কিরকম আটা বের হচ্ছে।"



নিউবার্গের বাসিন্দারা বাষ্পীয় পোতকে অভিনন্দন জানাল

"ক্লেরমণ্ট" ওয়েস্ট পয়েণ্টে পৌঁছলে দেখা গেল সমস্ত সামরিক শিক্ষার্থীরা একটা পাহাড়ের ওপর অপেক্ষা করছে। স্টীমারটি পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা প্রাণ খুলে হর্ষধ্বনি করে উঠল। বাষ্পীয়

পোতের যাত্রীদের মনে হল যেন সারা নিউবার্গ গ্রাম আর অরেঞ্জ কাউন্টির প্রায় সকলেই বেরিয়ে এসেছে। জলের ধার পর্যন্ত সমস্ত পাহাড়ের গা ভর্তি লোকের ভীড়। উপসাগরটি ছোট ছোট পাল তোলা নৌকোয় ভর্তি, তারা স্বাগত জানাচ্ছে, আর ফিশকিল থেকে আসা ফেরী নৌকোটি মহিলাদের ভীড়ে বোঝাই।

ঠিক সময় আলবানি পৌঁছবার পর "ক্লেরমণ্ট" নিউইয়র্কে ফেরার জন্যে আর একদল যাত্রী নিল। নিরাপদে ফিরে আসার পর রবার্ট টাকাকড়ি গুণে দেখল যে কিছু লাভ হয়েছে। পরের সপ্তাহে ক্রমে ক্রমে আরো লোক স্টীম বোটে আলবানি যেতে সাহস করলো। এতে স্থলপথে ঘোড়ার গাড়ি করে কষ্টকর ভ্রমণ বা পালের জাহাজে দীর্ঘকাল ধরে চলা, দুটোই এড়ানো যায়। হেমন্তের শেষে যখন ঠাণ্ডার জন্যে জাহাজ চালান বন্ধ রাখতে হল তখন আমেরিকার জল-পথে বাষ্পীয় পোত চলাচলের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।

তখনকার মত "ক্লেরমণ্ট"কে কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবার্ট সেটা ভাঙ্গতে শুরু করলো। নতুন কাঠ, নতুন পাটাতনের বীম, নতুন পাটাতন, জানালা, কেবিন আর নতুন বয়লার বসানো হল। পরের বসন্তে আবার যখন তাকে নদীতে ভাসান হল সেটা তখন প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নতুন জাহাজ, আগের চেয়ে অনেক চওড়া অনেক নিরাপদ। আর দেখতেও অনেক সুন্দর। এখন তার তিনটে কেবিনে চুয়ান্নটা বার্থ, একটা রান্নাঘর, খাবার ঘর, পানের ঘর। আর ভেতরটা রবার্ট সুন্দর ছবি, পালিশ করা কাঠ আর সোনার জলের কাজ দিয়ে চমৎকার করে সাজিয়েছে। এর ফলে আরো যাত্রী আসতে আরম্ভ করলো। অল্পদিনের মধ্যেই "ক্লেরমণ্ট"

হাডসনে নিত্যগামী জাহাজ হয়ে উঠল, আর লাভও বেশ হতে লাগল।

ইতিমধ্যে রবার্ট শ্যাম্প্লেন হ্রদ, লঙ্‌ আইল্যাণ্ড সাউণ্ড আর মিসিসিপি নদীতে বাষ্পীয় পোত নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করলো। জাহাজের কারখানাটি দেখতে দেখতে হাতুড়ি করাতের শব্দে আর লোহার কারখানাগুলি ভারী ভারী হাতুড়ির আওয়াজে মুখর হয়ে উঠল। পাশে চাকাওয়ালা বাষ্পীয় পোতের সুদীর্ঘ বর্ণোজ্জ্বল যুগের শুরু হল।

১২

হোপের সঙ্গে পাল্লা

যদি কখনো অগভীর জলে মাছ ধরে থাক, যেখানে মাছের মত তুমিও টোপটা দেখতে পাচ্ছ, তাহলে ঝাঁকের চালচলন সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান হবে। প্রথম সাহসী মাছটা—ধর একটা পার্চ—ভাসতে ভাসতে এসে কেঁচোটা ঠাহর করে দেখে। তারপর পিছু হঠে গিয়ে আবার আরেক দিক থেকে ভাল করে দেখবার জন্যে এগিয়ে আসে। শেষে একটু কামড়ে নেয়। তখন আরো কতক-গুলো পার্চ, যারা সাবধানে পেছনে অপেক্ষা করেছিল, তারা ছুটে এসে প্রথম মাছটা আরেক কামড় দেবার সুযোগ পাবার আগেই বঁড়শী সাফ করে দেয়।

দুঃখের বিষয় মানুষের বেলাতেও প্রায়ই এই রকমটাই ঘটে থাকে। "ক্লেরমণ্ট" তৈরির সময় রবার্ট যখন কাজ শেষ করবার জন্যে টাকার অভাবে পড়ে, তখন কেউ সাহায্য করতে আসেনি। লোকে তাচ্ছিল্য করে, এমনকি জাহাজটা নষ্ট করবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু এটা যখন সফল হল, তখন অন্যান্য আবিষ্কর্তা আর ব্যবসাদারেরা ওই ভীতু মাছের মতই ছুটে এল নিজেরা বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি করে

রবার্ট আর চ্যান্সেলার লিভিংস্টনের হাত থেকে ব্যবসাটা কেড়ে নেবার জন্যে।

এই সব প্রতিযোগীদের মধ্যে চ্যান্সেলারের শ্যালক জন স্টিভেন্স বলে এক আবিষ্কর্তা হলেন একজন। যদিও তিনি কয়েক বছর ধরে এই বাষ্পীয় পোতের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এবং নিজে কয়েকটা তৈরিও করেন, তবু সেগুলি সফল হয়নি। "ক্লেরমণ্ট" তৈরির জন্যে যখন আরো টাকার দরকার হয় তখন রবার্ট আর চ্যান্সেলার স্টিভেন্সকে অংশীদার করবার প্রস্তাব করেন। তিনি কিন্তু ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তা উপেক্ষা করেন। তিনি বলেন, "ক্লেরমণ্ট" চলবে না, কারণ ওটা ঠিকমত তৈরি হয়নি।

"ক্লেরমণ্ট" যখন হাডসনের ওপর চলতে আরম্ভ করল, প্রায় সেই সময়েই স্টিভেন্স কতকটা সেই রকমই একটি জাহাজ তৈরি করতে সমর্থ হন। এখন তিনি রবার্ট ও চ্যান্সেলারকে গিয়ে বললেন যে তিনি একটি জাহাজ তৈরি করেছেন। সেটি "ক্লেরমণ্ট"-এর চেয়ে অনেক জোরে চলবে। ওঁরা যদি তাঁকে অংশীদার হিসেবে না নেন তবে জাহাজটি তিনি সম্পূর্ণ করবেন এবং "ক্লেরমণ্ট"-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওঁদের ব্যবসাটি মাটি করবেন। যদিও আইনতঃ রবার্টের আবিষ্কারে স্বত্ব সংরক্ষিত ছিল তবু সে ও চ্যান্সেলার এই পারিবারিক ঝগড়ায় জড়িত হতে না চাওয়ায় স্টিভেন্সকে "ক্লেরমণ্টের" পাঁচভাগের একভাগ অংশ দিতে চাইলেন।

তাঁরা স্টিভেন্সকে বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের বাহাদুরী না দেওয়ায় এই দ্বিতীয় প্রস্তাবও তিনি গ্রহণ না করা স্থির করলেন। তার বদলে যে জাহাজটি তিনি তৈরি করছিলেন সেটি সমাপ্ত করে তার নাম

দিলেন "ফিনিক্স" এবং দুই অংশীদারের নাকের ওপর দিয়ে সেটি চালাতে শুরু করে দিলেন। ওঁরা এর জন্যে লড়াই করা স্থির করলেন এবং তা তাঁরা করলেনও। শেষে তাঁরা আইনের সাহায্যে "ফিনিক্স"কে আটক করলেন। এতে স্টিভেন্স দমলেন না। তিনি শুধুমাত্র জাহাজটা আটলান্টিক উপকূল দিয়ে ডিলাওয়্যার নদীতে পাঠিয়ে সেখানে চালাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে এক "ঘোড়ার জাহাজ" তৈরি করে রবার্ট ও চ্যান্সেলারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চালাতে লাগলেন। এটা আসলে ছিল জোড়া দেওয়া দুটো নৌকা, মাঝখানে প্যাড্‌ল্ হুইল বসানো। কিন্তু চাকাটা ঘোরাবার জন্যে স্টিভেন্স বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বদলে এক পা কল তৈরি করে দুটো ঘোড়ার সাহায্যে সেটি চালাতে লাগলেন। জিনিসটা বাষ্পীয় পোত নয় সুতরাং অংশীদারদের কিছু করার উপায় ছিল না।

ক্রমে একটি জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল যে স্টিভেন্স বোধ হয় না করতে পারেন এমন কাজ নেই। "আমি এইমাত্র জানতে পারলাম" ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট তাঁকে লেখে, "যে আপনার ফোরম্যান আমার কয়েকজন কারিগরকে হবোকেন-এ আপনার কাজে লাগাবার জন্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। আশা করি কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু তা যদি হয় এবং আমার কারখানা থেকে একটি লোকও যদি চলে যায় তবে ন্যায়ত আমার যে সব অধিকার আছে সেগুলি বজায় রাখবার চেষ্টা আমি করবই।"

স্টিভেন্স জবাব দিলেন যে চিঠিটা অপমানকর। রবার্ট কোন্ অধিকারের কথা লিখছে! তিনি বলেন যে কারিগরদের সম্বন্ধে

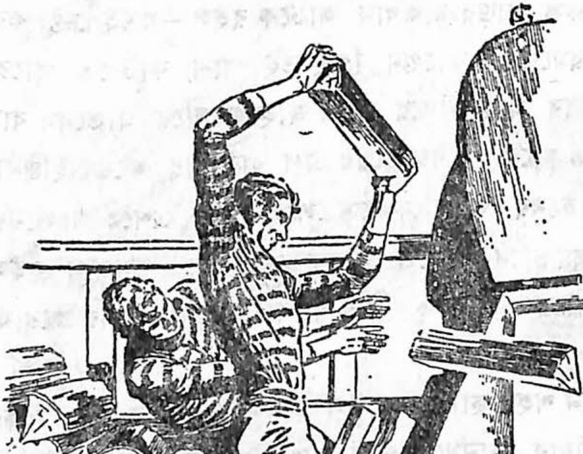
কোন কথাই তিনি জানেন না। আর তা ছাড়া তিনি কি করবেন না করবেন সে সম্বন্ধে রবার্টের ভয় দেখানোয় কোন ফল হবে না। রবার্ট তাঁর অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে লিখল যে স্টিভেন্সের কারখানার কোনো লোক তার লোকদের ভাঙ্গিয়ে নেবার চেষ্টা করছে এবং সে জানতে পেরেছে যে এ ব্যাপার স্টিভেন্সও জানেন। তারপর রবার্ট তার "অধিকার"-গুলির কথা বিবৃত করে।

"আমার ওপর কোন দিনই আপনার আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের দাবি ছিল না। তবু আমরা দু দুবার এগিয়ে গিয়ে আপনাকে আমাদের ব্যবসার অংশ দিতে চেয়েছি। কিন্তু আপনি যেহেতু নিজেকে বাষ্পীয়-পোতের আবিষ্কর্তা বলে চালাতে চান, সেইজন্যে সর্বদাই লিভিংস্টন অ্যাণ্ড ফুল্‌টনের সঙ্গে শত্রুতা করে গিয়েছেন।" অবশেষে রবার্ট স্টিভেন্সকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে এবিষয়ে লেখালেখি করার বা বলার ধৈর্য তার শেষ হয়েছে। এখন থেকে সে আদালতে স্টিভেন্সের জবাব দেবে।

অবশেষে অংশীদার দুজন স্টিভেন্সকে আটকাতে সমর্থ হয়। কিন্তু অন্য যে সব বিরোধীপক্ষের জাহাজ নদীতে গজিয়ে উঠতে আরম্ভ করল তাদের ঠেকান সেই প্রাচীন যুগের ন'মাথাওয়ালা জলসর্প হাইড্রা বধের মত ব্যাপার হয়ে উঠল—যার একটা মাথা কাটলে দেখতে দেখতে দুটো গজিয়ে উঠত! ১৮১১-তে রবার্ট বলে যে তার অধিকাংশ সময়ই কেটে যাচ্ছে বাইশজন "জোচ্চোর"কে কাবু করতে। এরা দল বেঁধে তার কয়েকজন কারিগরকে চুরি করে "হোপ" নামে একটা জাহাজ তৈরি করে। শেষে তাদের নাকের ডগা দিয়েই আলবানি আর নিউইয়র্কের মধ্যে সেটা যাওয়া-আসা করতে শুরু

করলো। এমন কি "হোপ"-এর কাপ্তেন একদিন "ক্লেরমণ্টের" কাপ্তেনকে দৌড়ের পাল্লা দিতেই চ্যালেঞ্জ করে বসল।

১৮১১র ২৭শে জুলাই ইতিহাসের প্রথম বাষ্পীয় পোতের দৌড়ের পাল্লার জন্যে দুটো জাহাজই আলবানির জেটিতে তৈরি হয়ে এল। ইঞ্জিনীয়াররা শুকনো পাইন কাঠ দিয়ে চুল্লীতে আগুন দিতে লাগল। কাঠগুলো ভীষণভাবে জ্বলতে থাকে। চিম্‌নী দিয়ে প্রচণ্ড ফুল্‌কি বেরোতে লাগল। হঠাৎ "ক্লেরমণ্ট" তৈরি হবার আগেই "হোপ"



ইঞ্জিনীয়াররা ফারনেসে কাঠ দিতে থাকে

জেটি থেকে বেরিয়ে পড়ে খাড়ির মধ্যে চলে এল। "হোপ"কে আগে বেরিয়ে যেতে দেখে "ক্লেরমণ্ট"-এর কাপ্তেন উদ্বিগ্ন হয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের প্রাণপণে কাজ করতে হুকুম করলে। আর কয়েক

মুহূর্ত বাদেই ভাল্‌ভ্‌ ঘোরালো। সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্পস্রোত গিয়ে ঢুকল। বেল্‌-ক্র্যাঙ্কগুলো ঝন্‌ ঝন্‌ করে ফ্লাই হুইলের ওপর চাপ দিল, আর প্যাড্‌লগুলিও জলের ওপর আঘাত করলো। "ক্লেরমণ্ট" দ্রুতগতিতে তার বিপক্ষের পেছন পেছন খাড়িতে গিয়ে পড়ল।

"ক্লেরমণ্ট" হোপের পাশ কাটাবার চেষ্টা করতেই তীরের লোকেরা উত্তেজনায় অধীর হয়ে চীৎকার করে লাফাতে শুরু করলো। "হোপ" কিন্তু খাড়ির মাঝখান আটকে রইল—যতই চেষ্টা করুক না কেন "ক্লেরমণ্টের" কাপ্তেন কিছুতেই পাশ কাটাতে পারে না। মাইলের পর মাইল ধরে দুটো জাহাজ আরো গতিবেগ বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। বয়লারের চাপ বাড়াবার জন্যে ইঞ্জিনীয়াররা আরো পাইনের গুঁড়ি ফেলতে লেগে যায়। শেষে আগুনের চুল্লী-গুলো ভীষণভাবে জ্বলতে আরম্ভ করলো। প্যাড্‌ল্‌ হুইলগুলো আরো জোরে ঘোরাতে গিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো থর থর করে কাঁপতে থাকে।

হাডসন শহর ছাড়িয়ে মাইল দুয়েক এগোবার পর "ক্লেরমণ্ট"-এর ইঞ্জিনীয়ার কোনমতে তার ইঞ্জিনটিকে মিনিটে আরো কয়েকবার বেশী ঘোরাতে সমর্থ হল। কাপ্তেনও খাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে "হোপ"কে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল। ইঞ্চি মেপে "ক্লেরমণ্ট" এগোতে লাগল। জাহাজের ওপরের লোকেরা উত্তেজনায় পাগল হয়ে উঠল। তারা চীৎকার করে দুটো জাহাজের মাঝখানের সরু জল রেখার ব্যবধানের ওপর দিয়েই পরস্পরকে ঘুষি দেখাতে থাকে। আস্তে আস্তে কিন্তু দৃঢ়ভাবে "ক্লেরমণ্ট" "হোপের" পাশাপাশি চলে

এল। ওর প্যাড্‌লের ঘায়ে জল ফেনিল হয়ে ওঠে। এখন দুজনেই সমান সমান যাচ্ছে। "হোপের" কাপ্তেন যখন অধীর হয়ে



পৃথিবীর প্রথম স্টীম বোট রেসে "ক্লেরমণ্ট" "হোপ"-এর সঙ্গে পাল্লা দিল

ইঞ্জিনীয়ারদের আরো স্টীম বাড়াতে বলল। "ক্লেরমণ্ট" তখন এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ দুই জাহাজের মাঝখানের জলরেখাটি সূক্ষ্ম হয়ে এল। শতকণ্ঠে বিপদসূচক চীৎকার উঠল কিন্তু আর সময় নেই। দুই জাহাজে লাগল এক ভীষণ ধাক্কা। ইঞ্জিনীয়ারেরা থ্ট্ল্ চেপে ধরলে, চাকাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। চোট খাওয়া জাহাজ দুটো ভাসতে ভাসতে থেমে গেল। ক্ষতির পরিমাণ দেখে তাদের মেজাজ গেল চড়ে। দুই কাপ্তেনই রেগে লাল হয়ে দৌড়ের পাল্লা থামিয়ে দিল। জাহাজ দুটো ভগ্নাবস্থায় নিউইয়র্কের দিকে চলল।

সেই হেমন্তে রবার্ট অবশেষে এটি আর "পারসিভিয়ারেন্স" নামে আরেকটি বেআইনি জাহাজের চলাচল বন্ধ করতে সক্ষম হল। আবার নদীতে "ক্লেরমণ্ট" আর ফুল্টনের তৈরি "কার অব্ নেপচুন" নামে আরেকটি জাহাজের আধিপত্য হল। 'রবার্ট কখনো এত পরিশ্রান্ত বোধ করেনি। এখন সে শুধু আবিষ্কর্তা নয়। এখন সে নির্মাতা, পরিচালক এবং বাষ্পীয় পোতের রক্ষক ছাড়াও তাকে নির্মাণ-পরিদর্শক, ব্যবসাদার এবং পুলিসের কাজও করতে হচ্ছিল।

১৩

মিসিসিপি বিজয়

একটিমাত্র বাষ্পীয় পোত চলাচলের ব্যবস্থা করতেই মানুষকে প্রায় সব কিছু একা করতে হয়। কিন্তু একসঙ্গে কয়েকটি জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করতে গিয়ে রবার্ট কাজের চাপে একেবারে ডুবে গেল। কিন্তু যতক্ষণ না দেশের সব কটি জলপথে এই বাষ্পীয় জাহাজ চলাচল করছে ততক্ষণ তার তৃপ্তি নেই। তার সবচেয়ে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা হল মনোঙ্গাহেলা, ওহায়ো আর মিসিসিপি নদীতে প্রথম বাষ্পীয় পোত নির্মাণের জন্যে নিকোলাস, জে. রুজভেল্ট নামে একজন ইঞ্জিনীয়ারকে পাঠানো।

মাত্র কয়েকজন লোক আর কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে রুজভেল্ট ১৮১১ সালে পিট্স্বার্গে এলেন কাজ শুরু করবার জন্যে। যে অবস্থায় তিনি "নিউ অর্লিয়্যান্স" নামে জাহাজটি তৈরি করেন সে আজকের দিনে কল্পনা করাই শক্ত। তাঁকে লোকজন নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে গাছ কাটতে হত। তারপর সেগুলো টেনে নদীতে নিয়ে গিয়ে জলে ভাসিয়ে যেখানে জাহাজ তৈরি হচ্ছে সেখানে নিয়ে যেতে হত। গাছের গুঁড়ি চিরে তক্তা বের করতে হত। তখনকার সেই সেকেলে করাত দিয়ে এই কাজটুকু করতেই যথেষ্ট হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম হত।

রুজভেল্টের লোকেরা সবে কাঠ কেটে জাহাজের খোল তৈরির কাজ শুরু করেছে, এমন সময় পেনসিলভ্যানিয়ায় ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়। মনোঙ্গাহেলার জল দ্রুত বেড়ে উঠল আর দেখতে দেখতে তাদের এই বহুমূল্য কাঠের স্তূপ ভেসে গেল। বেশীর ভাগই নদীর স্রোতের সঙ্গে চলে যায়। অনেক সপ্তাহ পরে নদী যখন আবার ফুলে উঠল, তখন গোটা জাহাজটাই ভেসে যাবার উপক্রম হয়।

অবশেষে ইঞ্জিন বসান হল। ১১৬ ফুট দীর্ঘ "নিউ অর্লিয়্যান্স" তৈরি সমাপ্ত হল। রুজভেল্টের মতলব ছিল পিটস্‌বার্গ থেকে মনোঙ্গাহেলা দিয়ে ওহায়ো, ওহায়ো দিয়ে মিসিসিপি আর বিস্তৃত মিসিসিপি দিয়ে নিউ অর্লিয়্যান্সে পৌঁছনো। অজ্ঞাত বাধাবিপত্তি ভরা, কখনো অগভীর, কোথাও বা বালির চড়া, পাহাড় আর প্রপাত ছড়ানো জলপথে এই উদ্ভট ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল যে এই রকম জলপথে বাষ্পীয় পোতের সাহায্যে চলা সম্ভব। অবশ্য কেবল রবার্ট ফুল্‌টন আর নিকোলাস রুজভেল্টেরই এই বিশ্বাস ছিল। লোকে তখন বলত যে স্থির জলে বা হ্রদের ঢেউয়ে বাষ্পীয় পোত চালান এক কথা, আর কোন খরস্রোতা নদীর বিপদ এড়াতে পারা আর এক কথা।

অবশেষে ১৮১১-র সেপ্টেম্বরে "অর্লিয়্যান্স" যাত্রা শুরু করবার জন্যে তৈরি হল। জাহাজটা তৈরি করতে গিয়ে যতরকম বাধাবিপত্তি এসেছে সবই রুজভেল্ট জয় করেছেন, কিন্তু এখন তিনি এক অজ্ঞাতপূর্ব বাধার সম্মুখীন হলেন। জাহাজ চালানোর জন্যে তাঁর মাঝিমাল্লার দরকার—কিন্তু একটি লোকও তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী নয়। কঠোর

পরিশ্রমী সীমান্তবাসী, যারা ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করেছে, তাদের পক্ষে এমন করাটা মোটেই সম্মানজনক নয়। বোঝা গেল যে তারা তীর-ধনুক বা খুলি চাঁচা দা, এ সবের সামনে দাঁড়াতে পারে কিন্তু স্টীম ইঞ্জিনের পাল্লায় পড়ে প্রাণ খোয়াতে রাজী নয়। সত্যি কথা বলতে কি কোন স্কাউট বা ফাঁদ পাতা শিকারীও জাহাজে কাজ নিতে রাজী হল না। শেষে একটি একটি করে রুজভেল্ট কোনমতে তাঁর চোদ্দজন লোককে জোগাড় করলেন। তাঁর দলে একজন কাপ্তেন পাইলট, ইঞ্জিনীয়ার, ছ'জন ডেকের খালাসী আর ফায়ারম্যান, একজন রাঁধুনী, খানসামা, দুটি ঝি আর টাইগার নামে একটা বড় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর জুটল। মিসেস রুজভেল্টও স্বামীর সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ধরলেন।

"এই রাস্তায় এইভাবে একটা মেয়েকে নিয়ে যাওয়া"—পিটস্-বার্গের লোকেরা বলাবলি করতে থাকে। "বরং ডিঙ্গিতে চড়ে আটলান্টিক পার হতে রাজি আছি।"

বুড়ো এক ভেলার মাঝির নদীপথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল। "যখন লুইসভিলের পর স্রোতের মুখে পড়বে তখন আর কিছু থাকবে না। স্রেফ জ্বালানী কাঠ হয়ে যাবে।"

রবার্ট ফুলটনের মত রুজভেল্টও এইসব আসন্ন সর্বনাশের ভবিষ্যৎ বক্তাদের উপেক্ষা করতে শিখেছিলেন, আর তাঁর স্ত্রীও এ নিয়ে তাঁর চেয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন না। সেপ্টেম্বরের সকালে, যেদিন জাহাজ ছাড়বার কথা সেদিন তিনি জাহাজে গিয়ে মনের আনন্দে তাঁর চোদ্দজন মাঝিমাল্লার সংসারের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লেগে গেলেন।

যাত্রার সময় যত এগিয়ে এল ততই সেই চিরাচরিত প্রথায় বিভ্রান্ত দৃষ্টি, অবিশ্বাসী আর বিদ্রূপকারীর দল নদীতীরে সার বেঁধে দাঁড়াতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দড়ি খুলে ফেলা হল, আর নিউ অর্লিয়্যান্স চমৎকারভাবে ডক থেকে বেরিয়ে প্যাড্ল্ করতে করতে নদীর খাড়িতে পড়ে স্রোতের মুখে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

নদীর প্রতিটি বাঁকের মুখেই কিছুটা ঘটবার সম্ভাবনার চিন্তায় মাঝিমাল্লারা সাগ্রহে প্রথম দিনের অধিকাংশ সময়ই ডেকের ওপর কাটাল। নদীর দুধারে বিরাট বন্য দৃশ্যাবলী। বাষ্পীয় পোতের আগমনে জন্তুজানোয়ার গভীর বনের মধ্যে পালাতে থাকে। তীরের কাছে অগভীর জল থেকে বড় বড় পাখি ডানা মেলে উঠে পড়ে। বিশেষ করে সন্ধ্যার ছায়ায় নদী যখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে আর তারাগুলো জ্বলতে থাকে তখন মনে হয় ওরা যেন অন্য কোন এক জগতে যাত্রা করছে। ইঞ্জিনের সুপরিচিত ঝকঝক শব্দ, প্যাড্ল্ হুইলের ছপছপানি আর জাহাজের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঢেউয়ের কুলুকুলু ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসে না।

অন্ধকার যখন এমন ঘন হয়ে উঠল যে পাইলট মিঃ জ্যাক্ আর কিছুই দেখতে পায় না তখন সে নদীর পাড় যেখানে খাড়া নেমে এসেছে গভীর জলে, সেইখানে জাহাজটা চালিয়ে নিয়ে গেল। ডেকের লোকেরা তখন জাহাজটাকে জলের ধারের একটা গাছের গায়ে শক্ত করে বাঁধল। বয়লারের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে, বাষ্পের ফোঁস-ফোঁসানি কমে শুধু ফিস্ ফিস্ করতে থাকে। অরণ্যের প্রান্তদেশে "নিউ অর্লিয়ান্সের" মাঝিরা ঘুমোয়।

পরের দিন ভোর হতেই আবার চাকা ঘুরতে শুরু করে। যে নতুন রাজ্যের ভেতর দিয়ে নদী বয়ে চলেছে তার বহু বিচিত্র দৃশ্য দেখতে, তার বিচিত্র ধ্বনি শুনতে মাঝিমাল্লারা ডেকের ওপর আবার উঠে আসে। নদীতীরের এক ছোট্ট শহরের সমস্ত অধিবাসী এই জাহাজটি দেখতে জড়ো হয়। তাদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মাঝিমাল্লারাও অভিনন্দন জানায়। দ্বিতীয় দিন "নিউ অর্লিয়্যান্স" জাহাজ সিন্‌সিনাটিতে এসে থামল আর ডেকের খালাসীরা নতুন জ্বালানী কাঠ নিয়ে এল। তারপর আবার চলল। সেখানকার লোকে কখনো বাষ্পীয় পোত চোখে দেখেনি। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এইভাবে দিন যায়।

পয়লা অক্টোবর, পুরোদিন চলে "নিউ অর্লিয়্যান্স" লুইস্‌ভিলে এসে পৌঁছল সন্ধ্যার পর। পূর্ণিমার রাতে লোকে যখন দেখল ধোঁয়া বেরোবার নল দিয়ে আগুন আর ফুল্‌কি বেরোচ্ছে আর সেফ্‌টি ভাল্‌ভ দিয়ে মেঘের মত বাষ্প আসছে তখন অনেকেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কেউ কেউ ভাবল প্রলয়কাল উপস্থিত। অন্যেরা মনে করল ১৮১১-র ধূমকেতুটাই বুঝি ওহায়ো নদীতে পড়েছে। "নিউ অর্লিয়্যান্স" যেখান থেকে এসেছে তার দূরত্ব শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেল। রুজভেল্টকে বীরের সম্মান দেওয়া হল। আর লুইসভিলের লোকেরা তাঁর আগমনের সম্মানে সাধারণ ভোজের আয়োজন করলো।

তারা বলল, "আপনাকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি; আর এতদূর আসতে পারার জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আরো আগে তীব্র স্রোতের মুখে আপনারা রক্ষা পাবেন না।

সে চেষ্টা না করতে আমরা অনুরোধ করছি ” তাদের যে তখনো বাষ্পীয় পোতের ওপর কোন ভরসাই নেই সেটা অবিলম্বেই রুজভেল্টের কাছে পরিষ্কার হল। তারা স্বীকার করলো, “আপনি অবশ্য নদীর স্রোত বেয়ে আসতে পেরেছেন, কিন্তু উজানে যেতে পারবেন না, কারণ স্রোত আপনার বিপক্ষে।”

“নিউ অর্লিয়্যান্স” স্রোতের মুখে বা বিপক্ষে চলতে পারে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত—রুজভেল্ট জবাব দিলেন। “তাছাড়া আমি নিশ্চয় জানি যে আমরা তীব্র স্রোতের ওপর দিয়েও যেতে পারব।” তাদের আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে, তার প্রতিদানে তিনি “নিউ অর্লিয়্যান্সের” ওপর তাদের নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। জাহাজটা যখন নিরাপদে নোঙর করা রয়েছে তখন প্রায় সকলেই নিশ্চিন্ত হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো।

কয়েকদিন পর রাত্রে যখন তারা দল বেঁধে জাহাজে উঠল তখন অনেকেই বেশ অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু সামনের কেবিনে তারা যখন ডিনারে উপস্থিত হল তখন সবাই স্বস্তিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। হঠাৎ একটা গুরুগুরু ধ্বনি শোনা গেল আর জাহাজটা কাঁপতে শুরু করলো। আগন্তুকদের মুখ শাদা হয়ে গেল। হাত থেকে কাঁটা খসে পড়ল। কেবল এক চিন্তা—“নিউ অর্লিয়্যান্স”-এর নোঙরের শেকল নিশ্চয় কেটে গিয়েছে, এখন ওটা নিরুপায়ভাবে লুইসভিল ছাড়িয়ে তীব্র স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে। ডেকের দিকে ছুটে গিয়ে অবাক হয়ে সকলে দেখলো যে জাহাজটা চলছে। আর যাচ্ছে তারা স্রোতের উল্টো দিকে! সবাইকে অবাক করে দেবার জন্যে রুজভেল্ট এই ভ্রমণের ব্যবস্থাটি করেন। মুখে তাঁর হাসির

রেখা। বাষ্পীয় জাহাজ যে স্রোতের বিপক্ষে চলতে পারে—সে সম্বন্ধে আর কারো সন্দেহ আছে কি? ওরা স্বচক্ষে দেখতে পেল বলেই বিশ্বাস করল।



"নিউ অর্লিয়্যান্স" মিসিসিপির প্রপাত দিয়ে সবেগে চলল

এই উত্তেজনাময় ভ্রমণের পর তীরে নেমে অতিথিরা সানন্দে

তাদের আগের কথা প্রত্যাহার করল। কিন্তু তবু তারা নিশ্চিন্ত ছিল যে "নিউ অর্লিয়্যান্স" তীব্র স্রোতের ওপর দিয়ে যেতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে রুজভেল্টও এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন না। এখন শুকনো দিন। নদীর জল অনেক নিচু আর এরই সব নদীর তলার পাথরগুলো জলের প্রায় ওপরে। অবশেষে তিনি স্থির করলেন যে যতদিন না একটা বেশ ভারী বর্ষা নামছে ততদিন তাঁরা অপেক্ষা করবেন, তাঁর আশা ছিল যে এর ফলে তরঙ্গসঙ্কুল নদীর ওপর দিয়ে "নিউ অর্লিয়্যান্স"-কে নিরাপদে নিয়ে যাবার মত জলের যথেষ্ট উচ্চতা হবে।

তাঁদের অপেক্ষা করবার সময়ে মিসেস রুজভেল্টের একটি সন্তান হয়। সেই হ'ল বাষ্পীয়পোতের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম যাত্রী। অবশেষে নভেম্বরে ঘোর বর্ষা নামল। দেখতে দেখতে ওয়াহোর জল ফুলে উঠল। রুজভেল্ট জানালেন যে এখনি যাত্রা করতে হবে; কারণ তাঁর হিসেব অনুযায়ী প্রপাতের সবচেয়ে অগভীর অংশের জলও এখন জাহাজ চলাচলের প্রয়োজনীয় গভীরতার চাইতে পাঁচ ইঞ্চি বেশি।

বয়লারে সেইমত খুব জোরে আগুন দেওয়া হল যাতে বাষ্পের চাপ যথাসাধ্য বাড়ান যেতে পারে। ডেকের ওপর সব কিছু বেঁধে রাখা হল। তীরে ভীত-সন্ত্রস্ত লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের সামনেই রুজভেল্ট মাঝি-মাল্লাদের শেষবারের মত উপদেশ দিলেন। তারপরই সেফ্‌টি ভাল্‌ভ থেকে তীক্ষ্ণ শব্দে বাষ্প বেরিয়ে এল। "নিউ অর্লিয়্যান্স" খাড়ির মধ্যে পড়ে স্রোতের মুখে প্রপাতের দিকে এগোল। স্ফীত জলস্রোতের ওপর জাহাজের গতিবেগ যতই বাড়তে থাকে মাঝি-মাল্লারাও ততই গম্ভীর মুখে যার যার জায়গায়

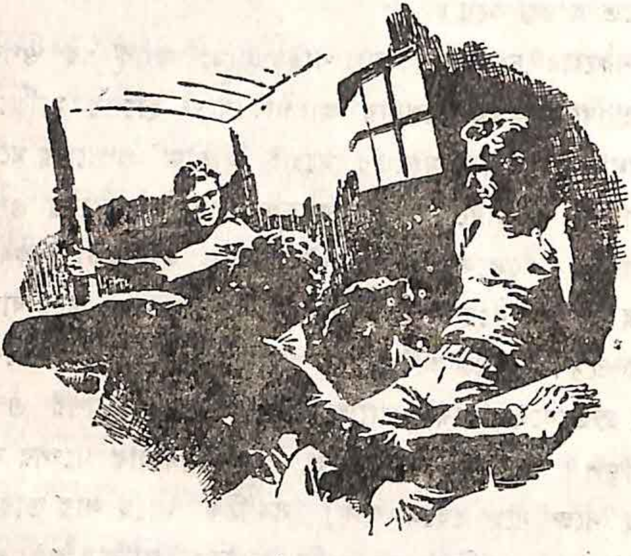
দাঁড়িয়ে থাকে। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর টাইগারও বিপদ আসন্ন মনে করে মিসেস রুজভেল্টের পায়ের কাছে শঙ্কিতচিত্তে গুটিসুটি মেরে বসে যায়। নদীর স্রোত ক্রমেই দ্রুতগতিতে "নিউ আর্লিয়্যান্স"-কে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। প্রপাতের কাছাকাছি আসতেই ওটা এদিক ওদিক দুলতে আরম্ভ করে।

এখন সকলের চোখ গিয়ে পড়ল পাইলট মিঃ জ্যাক্-এর ওপর, সে সামনের দিকে নজর রাখবার জায়গা থেকে হালের মাঝিকে সঙ্কেত জানায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজ প্রপাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চতুর্দিকে ধূসরবর্ণের ক্রুদ্ধ জলরাশি পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। ডেকের ওপর ছাট আসে। জাহাজটা একবার ডুবছে আর উঠছে, দুলছে আর কাঁপছে। সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে বাষ্প গর্জন করে ওঠে। "নিউ অর্লিয়্যান্স" পুঞ্জপুঞ্জ ফেনায় ভরা জলপথের মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে গিয়ে প্রপাতের নিচে শান্ত জলরাশির ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর সে স্থির হল, আর ইঞ্জিনীয়ার বাষ্পের মুখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। সব ঠিক আছে আর তারাও এখন নিরাপদ। সর্বশক্তিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রুজভেল্ট তাঁর লোকেদের যাত্রা শুরু করবার আগে কিছুক্ষণের জন্যে নোঙর ফেলতে বললেন।

তাদের এই কঠোর পরীক্ষার পর যখন তারা বিশ্রাম করছে এমন সময় নোঙর করে থাকা সত্ত্বেও জাহাজটা টলতে টলতে ঘুরে গেল, যেন তার তলাটা আটকে গিয়েছে। ভয় পেয়ে মাল্লারা পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে ওঠে। কয়েক মুহূর্ত দোলানির পর যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই ওটা

বন্ধ হয়ে যায়। কেন এমন হল কেউই তা বলতে পারে না। জাহাজটা পরীক্ষা করে দেখা গেল কোথাও কোন গোলমাল নেই।

মাঝরাতে আবার সেই দোলানি আর টাল খাওয়া শুরু হল। মাল্লারা ক্রমেই ভয় পেতে থাকে আর সেই সঙ্গে শরীরটাও যেন



জাহাজটা দুলতে থাকে

কেমন করতে থাকে। তবু কেউ বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি! পরদিন সকালে জাহাজ চলল। জাহাজের সকলেই নিস্তব্ধ, যেন বিরাট কোন দুর্ঘটনা আসন্ন। পরের কয়েকটি দিন "নিউ অর্লিয়্যান্স" আর তার মাল্লাদের পক্ষে ছিল বিভীষিকাময়। যে প্রশস্ত মিসিসিপিতে তারা এখন পড়ল সেটি পাইলট মিঃ জ্যাকের সম্পূর্ণ অচেনা। মনে হল নদীতে বান ডেকেছে, আর চলাচলের খাড়িটা যে কোনখানে তা বোঝাই গেল না।

মিস্থরীর নিউ মাদ্রিদে যাত্রীরা জানতে পারল যে তারা এক বিরাট ভূমিকম্পের মধ্যে পড়েছিল। জমি ফেটে ভাগ হয়ে বিরাট এক গহ্বর কতকগুলি বাড়ি গ্রাস করেছে। তাদের "নিউ অর্লিয়্যান্স"-এ তুলে নেবার জন্যে অনেকে অনুরোধ জানায়। ডাঙার চাইতে ওটাকেই তাদের নিরাপদ বলে মনে হয়। অন্যেরা আবার জাহাজের বাষ্পের স্তম্ভ আর মেঘের মত ধোঁয়া দেখে ভাবলো ভূমিকম্পের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে। তাতে তারা আরো ভয় পেলো। "নিউ অর্লিয়্যান্সের" ওপরকার খবর হল:

"কারোই কথাবার্তা বলার মত অবস্থা নয়—আর কথা বললেও সবাই অত্যন্ত নিম্নস্বরে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলত। জাহাজ চলবার সময় একমাত্র টাইগারই ভূমিকম্প সম্বন্ধে সচেতন ছিল। সে করুণস্বরে গুম্‌রে উঠত আর ঘুরে বেড়াত। আর যখন সে গিয়ে মিসেস রুজভেল্টের কোলে মাথা রাখত তখন সেটা হত একটা অস্বাভাবিক রকমের দুর্যোগের চিহ্ন। হুকুম নিম্নস্বরে দেওয়া হত আর নাবিকদের স্বাভাবিক প্রফুল্ল 'জী হুজুর' প্রায় শোনাই যেত না।"

জাহাজ স্রোতের মুখে ভেসে চলল—যদিও বিশ্রামের অভাবে মাঝিমাল্লারা অত্যন্ত ক্লান্ত। রাত্রে যখন তারা নদীতীরে জাহাজ বাঁধত তখন আশেপাশে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ার আওয়াজে ঘুমনো অসম্ভব হয়ে উঠত। কোথাও যেন কোন নিরাপত্তা নেই। একদিন সন্ধ্যাবেলা তীরের বদলে নদীর মাঝখানে এক দ্বীপের তলায় জাহাজ বাঁধা ঠিক হল। এটা অনেক নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল। রাতটা ভাল করে ঘুমোবার জন্যে মাল্লারা তাদের শোবার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাতে আবার জাহাজ কাঁপতে শুরু করলো। বাইরে ধাক্কা আর ঘষাঘষির মত শব্দ শোনা যায়।

দিনের আলো ফুটে উঠতেই ওরা হতভম্ব হয়ে দেখলো যে দ্বীপের চিহ্নমাত্রও নেই। বোঝা গেল যে ওটা ভেঙেচুরে ডুবে গিয়েছে।



ক্যানো ভর্তি রেড ইণ্ডিয়ান "নিউ অর্লিয়্যান্সে"-র দিকে ছুটে এল

যে গাছটার সঙ্গে জাহাজ বাঁধা ছিল সেটা জলের তলায় অদৃশ্য

হয়েছে, নোঙরটি তখনো তার সঙ্গে বাঁধা। দড়িটা কুড়ুল দিয়ে কাটতে হল। ব্যাপারটা শঙ্কাজনক। মিসেস রুজভেল্টের মনে পড়ে, তিনি কিছুই করতে পারতেন না—না ঘুম, না পড়া, না সেলাই করা। অর্ধেক সময় মিঃ জ্যাক ঠিকই করতে পারত না যে কোন্‌খান দিয়ে জাহাজটা চালানো হচ্ছে; কারণ অনেক জায়গায় নদী তার পুরোন খাত ছেড়ে যেখানে বন ছিল সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো "নিউ অর্লিয়্যান্স"-কে গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলতে হত। জঙ্গলের আধ আলো আধ অন্ধকারে যেন যাত্রীদের উদ্বেগ বাড়াবার জন্যেই কখনো কখনো শত্রুভাবাপন্ন রেড ইণ্ডিয়ানদের ডিঙ্গি চলাফেরা করত।

ইণ্ডিয়ানরা খবর পেয়েছিল যে "পেনেলোর" বা আগুনে ডিঙ্গি (ওরা "নিউ অর্লিয়্যান্সে"-র তাই নাম করেছিল) নদীর স্রোতের মুখে চলেছে। ওদের কাছে ১৮১১-র ধূমকেতু, ভূমিকম্প আর আগুনে ডিঙ্গি একই বস্তু। চিমনীর ফুল্‌কির সঙ্গে ধূমকেতুর ল্যাজের কোন তফাৎ নেই, যেমন প্যাডল্ হুইলের ঘড়ঘড়ানি আর জমির কম্পনও একই জিনিস। একদিন রেড ইণ্ডিয়ান ভর্তি একটা ডিঙ্গি জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে জলের ওপর দিয়ে সোজা "নিউ অর্লিয়্যান্স"-এর দিকে এল। ইণ্ডিয়ানরা হৈ হৈ করতেই ইঞ্জিনীয়ার থ্রট্‌ল্‌টা পুরোপুরি খুলে দিলো, আর প্যাডল্ হুইলগুলো পূর্ণবেগে চলতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে ক্যানোটা পিছিয়ে পড়ল। সেই রাত্রে রুজভেল্ট ডেকে একটা গোলমাল শুনতে পেয়ে ভাবলেন রেড ইণ্ডিয়ানরা বুঝি আক্রমণ করেছে। তিনি ছুটে বেরিয়ে ওপরে উঠেই দেখলেন যে কেবিনে আগুন লেগেছে। সবাই মিলে কোন

মতে আগুন নেবানো হল। যাই হোক ওটা ইণ্ডিয়ানরা লাগায় নি—কেউ কাঠগুলো স্টোভের খুব কাছে রেখে দিয়েছিল।

"নিউ অর্লিয়্যান্স" সমস্ত দুর্ঘটনার হাত থেকেই উদ্ধার পেল। অবশেষে ভূমিকম্পের এলাকা থেকে বেরিয়ে এটি নিম্ন মিসিসিপির সুন্দর এলাকায় এসে পৌঁছল। যাত্রার শেষ শান্তিময় দিন ক'টি ডেকের কর্মীরা, যারা পাওনার অতিরিক্ত উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়েছে, তারা স্বস্তিতে হাত-পা ছড়িয়ে কাটালো। নাচেজ্-এ তাদের বিরাট এক অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। যে শহরের নামে জাহাজের নাম, কয়েকদিন পরে সেইখানে তাদের জন্যে আরো বড় উৎসব অপেক্ষা করেছিল।

"নিউ অর্লিয়্যান্স" তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছল, আর মিসিসিপিতে বাষ্পীয় পোত চলাচলের যুগ শুরু হল।

১৪

স্মরণীয় ব্যক্তি

শিল্পী বেঞ্জামিন ওয়েস্ট, যিনি ছাব্বিশ বছর আগে লণ্ডনে রবার্ট ফুলটনের শিক্ষক ছিলেন, তিনি ১৮১৩ সালে একটি চিঠি পেলেন। তাতে দেখলেন যে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের এখন চোদ্দটি জাহাজ আমেরিকার হ্রদ, নদী আর উপসাগরে চলাফেরা করছে—সেই ক্যানাডার সীমানা থেকে নিউ অর্লিয়্যান্স পর্যন্ত। "আর আমি (আরো) তেরটি, বিভিন্ন জলপথের জন্যে তৈরি করছি," রবার্ট সগর্বে জানিয়েছিল।

এখন তার পরিকল্পনা ছিল ভারতবর্ষের গঙ্গা নদীতে বাষ্পীয় জাহাজ নির্মাণের। আর রাশিয়ার জন্য পাশে চাকা লাগানো এক নৌবহর সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছিল। অনেক বছর ধরেই সে ইরি খাল খননের জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছিল। এখন সে এই মানুষের তৈরি বিরাট জলপথের নকশা নির্মাণকারী কমিটির একজন সদস্য। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সে চ্যান্সেলার লিভিংস্টনকে লিখল যে বাষ্পচালিত রেলপথের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও সে রীতিমত চিন্তা করছে।

১৮১২-তে ইউনাইটেড স্টেটস যখন আবার গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার একটি যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ল রবার্ট তখন সাগ্রহে

টর্পেডো আর সাবমেরিন তৈরির কাজে লেগে গেল। সে পৃথিবীর প্রথম যুদ্ধ-জাহাজের একটি নকশা তৈরি করলো। ১৮১৪-র গোড়ায় সরকার তাকে এটি তৈরির কাজে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৬৭ ফিট লম্বা আর ৫৬ ফিট চওড়া এই যুদ্ধ-জাহাজটি ১৮১৪-র ২৯শে অক্টোবর তারিখে ভাসানো হল। এর সামনের দিকে ছিল দুটি ১০০ পাউণ্ড ওজনের কামান আর পাশে বত্রিশটি পোর্ট হোল, তাতে অতগুলিই গোলা ছুঁড়বার মত কামান বসান। এতে বিরাট একটি বাষ্পচালিত পাম্প আর নল বসানো ছিল যাতে তীব্র জলের ফোয়ারা ছেড়ে শত্রুপক্ষের জাহাজের নাবিকদের ভাসিয়ে তাদের কামানগুলি ভিজিয়ে দেওয়া যেত।

"ফুল্‌টন দি ফার্স্ট" এই যুদ্ধ-জাহাজ ইংরেজদের হাত থেকে নিউইয়র্ক পোতাশ্রয়টি রক্ষার জন্যে তৈরি হয়। এটি ভাসানো হতেই রবার্ট এর বিরাট বাষ্পীয় ইঞ্জিনটি বসানোর কাজে লেগে গেল। এই যুদ্ধ-জাহাজের কথা শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে ইংরেজরা বন্দী করবার আদেশ দিয়ে এর আবিষ্কারকের পেছনে গুপ্তচর লাগালো।

একদিন রাত্রে লঙ্‌ আইল্যাণ্ড সাউণ্ডের ইংরেজ জাহাজ থেকে ডাঙায় একটি বাড়ি চড়াও করবার জন্যে একদল সৈন্য পাঠানো হল। রবার্ট সেখানে আছে বলে ওরা খবর পেয়েছিল। বাড়ি আক্রমণ করে লুটতরাজ করা হয় কিন্তু রবার্টকে ধরতে পারা যায়নি। সেখানে তার থাকবার কথা ছিল বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তার আসতে বিলম্ব হয়।

এদিকে এইসব নানা ব্যাপারে তার দুশ্চিন্তায় দিন কাটলেও সে তার পরিবারকে উপেক্ষা করেনি। তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে।

"ক্লেরমণ্ট"-এর প্রথম যাত্রার পর সে সুন্দরী হ্যারিয়েটকে বিবাহ করে এবং নদীর ধারে এক বিরাট বাড়িতে বসবাস শুরু করে। এখানে সে তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করত আর আবার মনের আনন্দে ছবি আঁকত। তার নিজের মত তরুণ আশাবাদী শিল্পী আর সম্ভাবনাময় আবিষ্কারকদের অনেক টাকা সে দিত। সে সানন্দে তার বোনেদের পেনসিলভ্যানিয়ার খামারে নতুন খামার বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিল এবং দামী গরু-ভেড়া উপহার দিয়েছিল।

যন্ত্রবিদদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ যন্ত্রবিদ বলে তার কারখানার লোকেরা তাকে সম্মান আর ভক্তি করত। রবার্টের একজন কর্মী পরে বলত, "আমরা ওঁকে কারখানায় দেখলেই খুশি হয়ে উঠতাম। বেতের ছড়ি হাতে ওনাকে সর্বদাই যেন কোন বড়ঘরের ইংরেজ ভদ্রলোক বলে মনে হত।"

রবার্টের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার বলত, "আজ পর্যন্ত আমার মনে তাঁর ছবিটি পরিষ্কার ভাসছে। পুরুষ মানুষের সমস্ত গুণের সঙ্গে তাঁর শিশুর মত নরম ভাব ছিল। কোনদিনও আমি তাঁর অধীনস্থ কোন কর্মীদের কড়া কথা বলতে শুনিনি—তা তারা যাই করুক না কেন। যখন তাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হত তখনকার কথা মনে পড়ে। ওয়েস্ট কোটের বোতাম খোলা, গভীর চিন্তায় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করছেন। আশেপাশের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।"

১৮১৫-র জানুয়ারীতে তার যুদ্ধ-জাহাজে ইঞ্জিন বসানোর সময় তাকে তার বন্ধু মিঃ এমেট-এর সঙ্গে একবার নিউ জার্সি যেতে হয়। ফেরার পথে দুজনে রবার্টের কারখানায় জাহাজগুলো কেমন মেরামত হচ্ছে তাই দেখবার জন্যে ঘণ্টা তিনেক থাকে। বেরিয়ে

এসেই তারা দেখলে ফেরী নৌকোটা বরফ ঠেলে জলের দিকে যেতে শুরু করেছে।

"চলে আস্থন" রবার্ট চেঁচিয়ে উঠল। "বরফের ওপর দিয়ে শর্ট-কাট করে আমরা ফেরী ধরব।" সেই শীতের মধ্যে দুজনে ছুট দিলে।



অনেক কষ্টে রবার্ট মিঃ এমেট-কে জল থেকে টেনে তুলল

হঠাৎ কোন কথা নেই এমেটের পায়ের তলার বরফ ধসে গেল আর তিনি হাডসনের ঠাণ্ডা জলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। রবার্ট সেদিকে ছুটল। প্রাণপণ চেষ্টার পর সে তার বন্ধুকে জল থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে টেনে আনলো। বাড়ি ফিরে, রবার্ট খুব অসুখে পড়ল।

ডাক্তারেরা তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন। কিন্তু যেই তার কানে এল যে যুদ্ধ-জাহাজে যারা কাজ করছে তাদের তাকে প্রয়োজন অমনি সে উঠে জামাকাপড় চড়িয়ে সারা রাস্তা এই ঠাণ্ডার মধ্যে গিয়ে 'পলাস্ হুক'এ হাজির হল। এটা তার পক্ষে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হল। সে ভয়ানক ভাবে অসুখে পড়ল। মাত্র ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সে জীবিত থাকে।

যে দুঃসাহসিক ঘটনার ফলে তার মৃত্যু হয় সেটি তার জীবনের অন্যান্য ঘটনার মতই তার স্বদেশ এবং নিউইয়র্কের লোকের মনে অনুপ্রেরণা জাগায়। তারা তাকে যে সম্মান দেখালো সে সম্মান ইতিপূর্বে কোন সাধারণ নাগরিককে দেওয়া হয়নি।

নিউইয়র্ক রাজ্যের আইনসভা বিবৃতি দিলেন যে কয়েক সপ্তাহ ধরে শোক পালন করা হবে, এবং জাতীয় সরকারের কর্মচারীরা নিউইয়র্ক সিটিতে উপস্থিত হল। সেখানে শবযাত্রার মিছিলের দুধারে স্তব্ধ জনতা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। গীর্জায় ঘণ্টা বাজতে লাগল আর প্রতি মিনিটে ওয়েস্ট ব্যাটারী আর বিরাট বাষ্পীয় যুদ্ধ-জাহাজ "ফুল্‌টন দি ফার্স্ট" থেকে কামানের গভীর শব্দ শোনা যেতে লাগল।

১৫

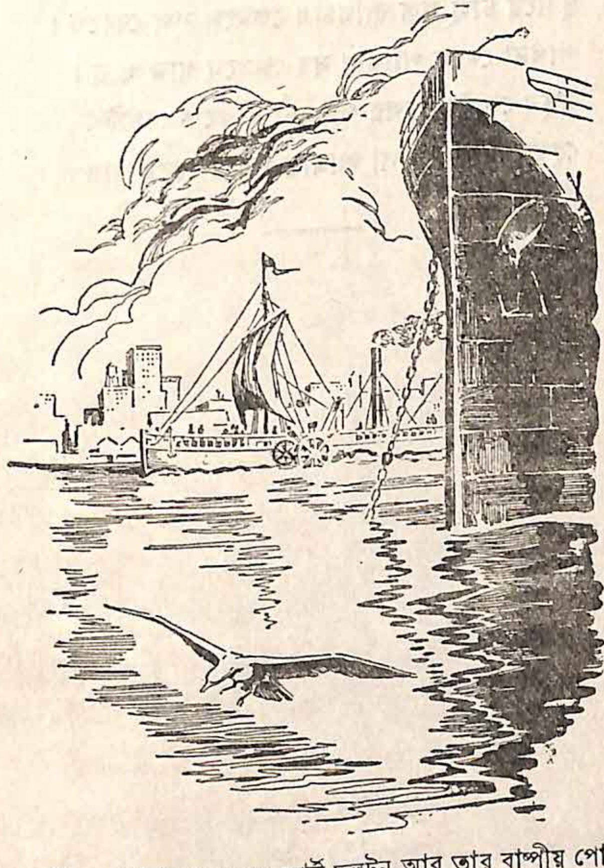
'ক্লেরমেণ্ট' আবার ভাসল

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্লেরমণ্ট'-এর ঐতিহাসিক যাত্রার একশ দু'বছর পরে যে নিউইয়র্ক আজ বিরাট হয়ে উঠেছে সেখানে হাডসন নদীর আবিষ্কর্তা হেনরী হাডসন এবং তাতে বাষ্পীয় পোত চলাচলের প্রচলন কর্তা রবার্ট ফুল্‌টনের স্মৃতিতে এক নৌ বিভাগীয় উৎসব হয়।

সাতটি জাতির যুদ্ধ-জাহাজের এক বিশাল বাহিনী যুক্ত হয়ে প্রথম আধুনিক যুদ্ধ-জাহাজের নির্মাতাকে সম্মান প্রদর্শন করে। পাশে চাকা লাগান বাষ্পীয় জাহাজের এক বাহিনী (তাদের কয়েকটি ৪০০ ফিটেরও বেশি লম্বা আর প্রায় পাঁচতলা বাড়ীর সমান উঁচু) সগর্বে যুদ্ধ-জাহাজগুলির পাশে ভেসে যেতে লাগল। হাজার হাজার পতাকা উড়ছে। হাডসনের তীর থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগল।

জাহাজের এই দীর্ঘ শোভাযাত্রার আগে আগে "ক্লেরমণ্ট" বলে আরেকটি জাহাজকে চলতে দেখা গেল—সেটি রবার্টের আসল জাহাজটির হুবহু নকলে তৈরি। নল থেকে তার কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে, ইঞ্জিন ঘস্ ঘস্ করছে আর প্যাডল হুইলগুলি জলের ওপর ছপ্ ছপ্ করে পড়ছে। এর ওপরে প্রথম দিনের যাত্রার সময়

যাঁরা ছিলেন তাঁদের পৌত্র এবং প্রপৌত্ররা। তাদের ১৮০৭ সালের পূর্বপুরুষদের মত এরাও সবচেয়ে ভাল পোশাকে সজ্জিত।



১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক শহরে রবার্ট ফুল্‌টন আর তার বাষ্পীয় পোতকে সম্মান দেখানো হয়

নতুন "ক্লেরমণ্ট" তাদের নিয়ে বেশি দূর যেতে না যেতেই তাদের কণ্ঠে গান জেগে উঠল। একটি স্কটিশ গাথা—এক গরীব কৃষকের

ছেলে যে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক হয়েছিল তারই প্রিয় সঙ্গীত ঃ

দুধারে ঢালু ফুল বাগিচায় কেমনে ফুল ফোটে।
পাখনা মেলে পাখিরা সব কেমনে গান গায়।
নতুন ফোটা ফুলের গন্ধ চৌদিকেতে ছোটে।
হেথায় বসে একলা আমার পরাণ ফেটে যায়।

পেনসিলভ্যানিয়ার এক কৃষিজীবীর ছেলে রবার্ট ফুল্টন বেঞ্জামিন ওয়েস্টের মত শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখত। চিত্র-শিল্প শেখবার জন্যে বহু কষ্টে সে লণ্ডনে উপস্থিত হল। দীর্ঘ দিন সাধনার পরও দেখল এপথে তার সামনে দুস্তর বাধা। ছেলেবেলায় যন্ত্র শিল্পের প্রতিও তার আকর্ষণ কম ছিলনা, অল্পদিন বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়েছে। সে ভাবলো যদি বাষ্পচালিত জাহাজ একটা তৈরি করা যায়……। তারপর শুরু হল তার কঠোর পরিশ্রম। আগেও অনেকে একাজে হাত দিয়ে বিফল হয়েছে। সে কিন্তু বিফল হবেনা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে রইল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর আমেরিকা এই তিন দেশ নিয়ে তার বাষ্পীয় পোত আবিষ্কারের ইতিহাস। অবশেষে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তার দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে প্রথম বাষ্পীয় পোত জলে ভাসল।